ব্যাবিলন কথকতা

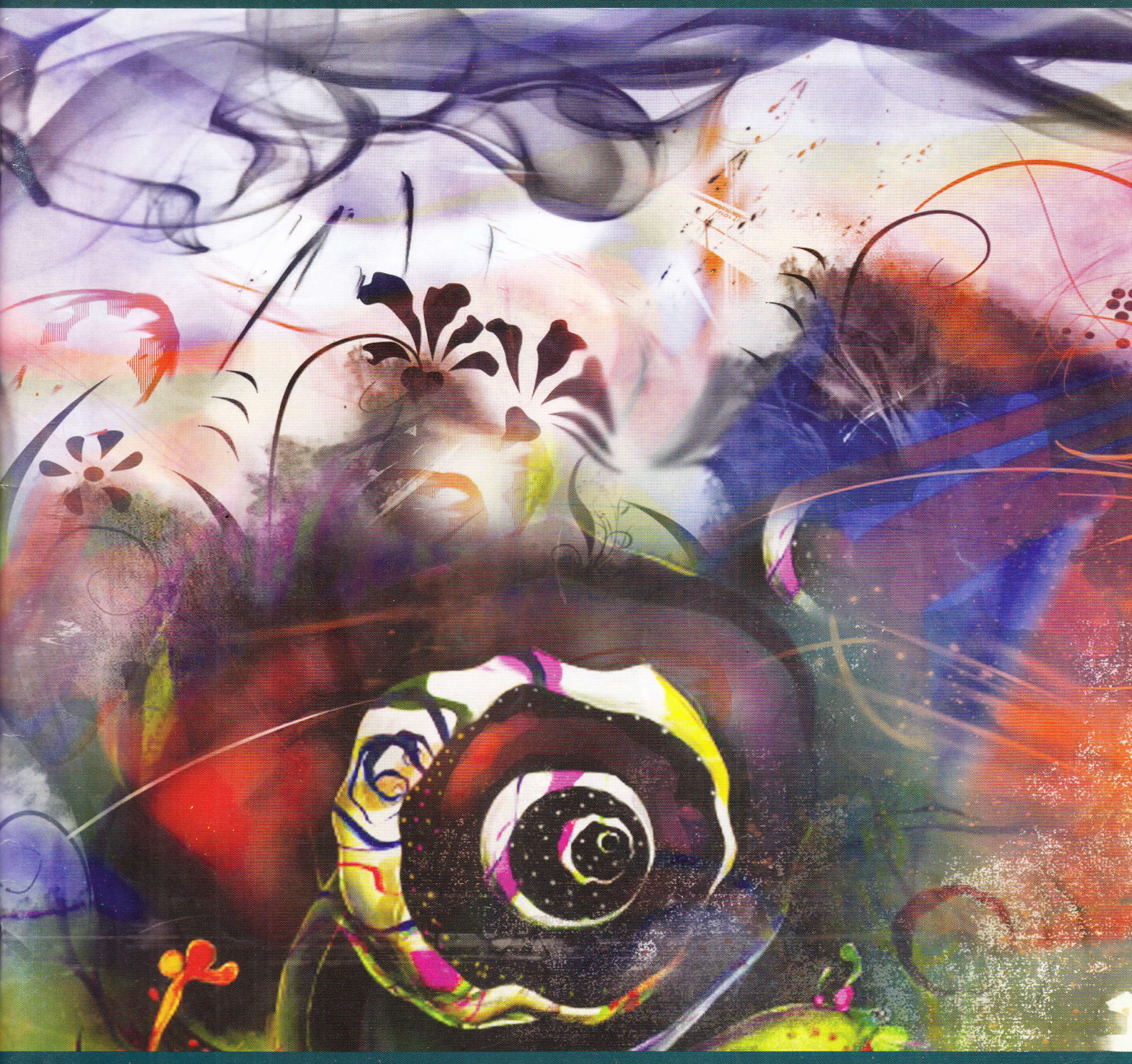

৮ম সংখ্যা

১৬ ডিসেম্বর ২০১৩

ব্যাবিলন গ্রুপ

NEWGEN

Transforming Technologies for Tomorrow

Newgen Technology Limited has its roots in designing, developing and breaking through solutions over Open Source innovations. Beside Open Source technology it has also built strong capabilities on Business Intelligence & Analytics using Oracle Technology.Newgen has a strong team to provide world class training on Oracle and Java for IT professionals.

Products & Services

- ✓ Newgen ERP & CRM Solution
- ✓ Newgen Collaboration Suite
- ✓ Newgen Business Analytics
- ✓ Newgen point of service(POS)
- ✓ Enterprise Solution and Consultancy
- ✓ Oracle License sale
- ✓ Oracle License Renew
- ✓ Training and Consultancy
- ✓ Implementation
- ✓ Support and Maintenance
- ✓ Manage Service

Newgen ERP is a web based Domain-driven, Database-independent Multi-layered, Mobile App Friendly ERP

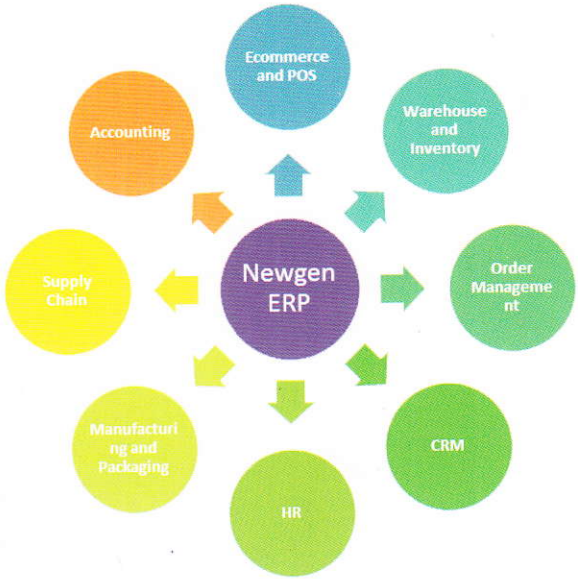

Features

- ✓ Enterprise Java J2EE foundations, great implementation of Service Oriented Architecture
- ✓ Domain driven architecture embraces object-oriented development model with integrated Hibernate persistence and Spring framework
- ✓ Rich AJAX user interface development with Google Web Toolkit
- ✓ Business intelligence and reporting with Pentaho and Jasper Reports
- ✓ Compatibility with MySQL, PostgreSQL, Oracle, and MS SQL Server

Benefits

- ✓ Single and Centralized Platform but separately manage all your legal entities (subsidiaries) accounting.
- ✓ Fully configurable, shape the solution as your business need and hence faster adoption.
- ✓ Internationally proven a fully integrated and modular SOA based J2EE application suite.
- ✓ Easy Integration with other standard applications, all services can be exposed as Web Service or RMI
- ✓ Service. You can easily build any mobile applications on any platform.

ORACLE Gold Partner | IBM Business Partner | Java | LIFERAY | ofbiz | MEMBER BASIS | BASIS

CONTACT

Hotline:9023495-6, 9023462-3 Ext : 405,406.
Email:info@newgenbdworks.net,
Web: www.newgen-bd.com

সম্পাদক:
এস এম এমদাদুল ইসলাম

সহ-সম্পাদক:
মাহমুদ আলম সিদ্দিকি

বিশেষ সহযোগিতা:
আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ
জেভিয়ার বিপ্লব দাস
আরিফ হোসেন

অলংকরণ:
ফারহানা রহমান সুরভী
আব্দুল্লাহ আল-রানা ফরহাদ
মাহমুদ আলম সিদ্দিকি

প্রচ্ছদ ও শিল্প নির্দেশনা:
স্বাধীন খান

সার্বিক সহযোগিতা:
ব্যাবিলন পরিবার

মুদ্রণ:
অক্ষর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
০১৫৫২৩৭৪৫৮৪, ৮৬২২৯০১

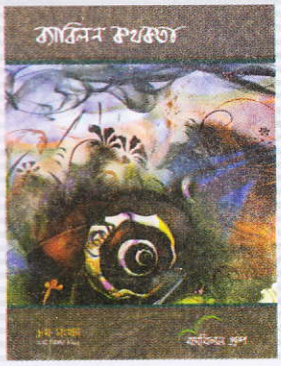

সূচিপত্র

শুভেচ্ছা বাণী	সেলিনা হোসেন	২
সম্পাদকীয়		৩
'কত হাজার মরলে পরে মানবে তুমি শেষে...'	মোহাম্মদ হাসান	৫
অন্ধকার; আলোয় যাই	মেহেদী হাসান	৮
মাগো তোমায় মনে পড়ে	মোঃ নূর আলম	১০
আমার কথা	এ এইচ এম সামিউল বাশার রাজা	১০
সালাদ	এস এ এম ফারুকুজ্জামান	১১
ঢাকা শহর	মোঃ এরশাদুল হক	১১
ঝরে যাওয়া স্বপ্ন	জুলিয়া আলম জলি	১২
স্বপ্নাতুর	মাহমুদুল হাসান	১২
ব্যাবিলন কথকতা	মোঃ জামসেদ আলী	১৩
তাই আমি দেবদাস	আব্দুল কাদের	১৩
অন্ধকারে আলো	কাজল কান্তি দাস	১৪
কষ্ট এবং...	কুলসুমা সাথী	১৭
প্রলাপ	এস এম আরিফ রাজ্জাক	১৮
যেতে হবে বহুদূর	আব্দুল কাদির হোসেন (তুহিন)	১৯
তুমি শুধু...	হুমায়ুন কবির	২০
ভাগ্যবতী	মোছাঃ পারুল খাতুন	২১
বাংলার ভেনিস	মিরাজুল ইসলাম	২১
নদী পথের স্মৃতিকথা	উম্মে সালমা ডালিয়া	২২
কৈশোরের কতিপয় কোলাজ-১	মাহমুদ আলম সিদ্দিকি	২৪
অমর ব্যাবিলন	মোঃ সুরুজ্জামান (মানিক)	২৫
শ্রমিক	মোঃ রবিউল ইসলাম (রবি)	২৫
নিজেকে জানো এবং নিজের মতো করে বাঁচো	আহমেদ তানিম	২৬
গুড্ডি	মোঃ জোবায়দুল ইসলাম	২৮
অবাধ্য মন	রোজিনা আক্তার	৩০
ছড়া	মোঃ মমিনুল ইসলাম (আরিফ)	৩০
আমি ও আমার ভালোবাসা	সুলতানা খাতুন	৩১
হারায়ে খুঁজেছি যারে	জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা	৩২
কাজ	মোঃ মামুন হোসেন	৩২
ছিনতাই	মৌমিতা	৩২
দর্জি বিজ্ঞান ঃ এসো নিজে করি	আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ	৩৩
হৃদয়ের একদিন	এ কে এম গোলাম মহ্হী চৌধুরী	৩৮
স্মৃতিকথায় দাদাভাই	পুতুল বাড়ৈ	৪৫
A Business Trip To Capetown, South Africa	Muhammad Saiful Hoque	৪৭

পোশাকশিল্পে শিল্পের ব্যতিক্রমী চর্চা

ব্যাবিলন গ্রুপ থেকে আমন্ত্রণ পাই একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। তারিখটি ছিল ২০১২ সালের ১৫ ডিসেম্বর। এটি ছিল প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং শ্রমিক বাহিনীর সৃজনশীল চর্চার একটি অন্যরকম দিন। এমন একটি অনুষ্ঠানের কথা জানতে পেরে আনন্দিত হই। একটি পোশাকশিল্প কারখানায় এমন আয়োজন হতে পারে তা আমার ভাবনার অতীত ছিল।

সৃজনশীলতা মানুষের সহজাত প্রবণতা। এই প্রবণতা বিচিত্র বিষয়মুখী। এক একজন এক একভাবে তার প্রকাশ ঘটান। সৃজনশীলতার মাত্রা পোশাকশিল্পের ডিজাইনকেও প্রভাবিত করে। এটি শুধু সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, চলচ্চিত্র, পেইন্টিং ইত্যাদি নয়। বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আলোকিত করে সৃজনশীলতা। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান যখন তার কর্মীবাহিনীর জন্য সাহিত্যচর্চার ব্যবস্থা করেন এবং সেসব লেখা প্রকাশের জন্য 'ব্যাবিলন কথকতা' প্রকাশ করেন সেটি সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণার উৎস।

মানুষের মনন-মেধা-চিন্তার জায়গাটি যদি চর্চিত হয় তবে মানুষের বেঁচে থাকা অনেকখানি অর্থবহ হয়। ব্যাবিলন পোশাকশিল্প কারখানা এমন কাজটি করে মানবাধিকার সুরক্ষায় মানুষকে সহযোগিতা দিচ্ছে। এই মৌলিক সূত্রটি আমাদের সংস্কৃতির সম্পদ। এই মূল্যকে অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই। আমি এই কর্মকান্ডে অংশ নিতে পেরে গর্বিত।

মানুষের মূল্যকে মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে ব্যাবিলন যে ভূমিকা পালন করছে তা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করছে। আমাদের প্রত্যাশা এমন ধারা অব্যাহত থাকবে।

'মুক্তা ঝরা ব্যাবিলন' শিরোনামে কবিতা লেখেন মোসাঃ উম্মে হাবিবা ইয়াসমিন-

ব্যাবিলন তুমি আমাদের সাজানো ফুলদানি
তুমি মোদের আঁধার জীবনে আলোর ঝলকানি।
.....
স্বাধীন হল ভুবন আমার ধন্য এ জীবন
তুমি মোদের আশার আলো, প্রিয় ব্যাবিলন।

সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে আমরা ব্যক্তি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের এগিয়ে আসাকে স্বাগত জানাই। যেন উম্মে হাবিবার মতো প্রত্যেক কর্মী তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রতি সৎ থাকেন। নিজের অধিকার অক্ষুন্ন থাকা দেখতে পারেন।
সবাইকে শুভেচ্ছা।

২৫ নভেম্বর ২০১৩

সেলিনা হোসেন
কথাশিল্পী
সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

সম্পাদকীয়

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ! ২০১২ এর শেষের দিকে আমাদের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তাদের এক সাধারণ সভায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম–২০১৩ সাধারণভাবে বাংলাদেশের রপ্তানি পোশাকশিল্পের জন্য ও বিশেষভাবে ব্যাবিলন গ্রুপের জন্য এই শিল্পের ইতিহাসে সর্বোচ্চ প্রসারের বছর হবে। এই শিল্পে আমার সুদীর্ঘ অবস্থান ও অভিজ্ঞতা আমাকে ওরকম সম্ভাবনাই দেখাচ্ছিলো। কিন্তু হায়! মানুষ ভাবে এক, ঐশী ক্ষমতা করেন আরেক। ২০১৩ তে ১৩'র প্রাবল্য এত প্রকট ও স্পষ্ট হবে কে জানতো?

গত সংখ্যার এই পাতায় আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম–তাজরীন ফ্যাশনের ভয়াবহতার পর এই শিল্পকে সুসংহত করতে আর কোন চরম বিপর্যয়ের প্রয়োজন হবেনা। আমার সেই আশাবাদকে ব্যঙ্গ করে মাত্র ক'মাসের ব্যবধানে ইতিহাসের চরমতম দুর্ঘটনাটি ঘটলো সাভারের রানা প্লাজায়। সারা পৃথিবীকে এদেশকে চেনাবার জন্য বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক দুর্যোগ যেন যথেষ্ট ছিলোনা। ওগুলো সত্ত্বেও যারা আমাদেরকে জানতোনা–চিনতোনা তারা রানা প্লাজা ধ্বসের কল্যাণে দ্রুত একটু বেশিই জেনে গেলো। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক বিশ্বে এক তোলপাড় হয়ে যায়। বদলে যায় রাজনৈতিক আবহাওয়া চিরতরে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ পূর্ব বিশ্ব আর কখনো ফিরে আসবে না।

২০১৩ এর ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশের সাভারস্থ রানা প্লাজার পাঁচটি পোশাক কারখানাসমেত ভবন ধ্বসের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে পোশাক ক্রেতাগোষ্ঠীর ভেতরে ঠিক তেমনি এক পরিবর্তন ঘটে গেছে। আমার মনে হয় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের হয়তো অবসান হবে এক সময়। কিন্তু দেশের পোশাকশিল্প সম্ভবত আর কখনো ফিরে পাবেনা তার স্বাভাবিক ও সফল দিনগুলো। অন্তত সহসাতো নয়ই। আমার কণ্ঠে নিরাশা! বাস্তবকে সঠিকভাবে অনুধাবন করলে আমি আশাবাদীতো হতেই পারছিনা। পোশাকশিল্পের মহাসংকট কাটিয়ে সুদিন ফিরিয়ে আনতে চাইলে দরকার মহাপরিকল্পনা ও তার দ্রুত সফল বাস্তবায়ন। এই কাজটাই আদৌ হবে কিনা, হলে কিভাবে হবে, কবে হবে, কার দ্বারা হবে– আমি বুঝতে পারছিনা।

ব্যাবিলন কথকতার পাঠক–পাঠিকারা উপরোক্ত আমার আবেগপ্রসূত বিস্ফোরণ ক্ষমা করবেন। মহাসংকটের এই বছরে ব্যাবিলন গ্রুপ অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মতো ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। রপ্তানি কমেছে, প্রবৃদ্ধি কমেছে, কমেছে ব্যবসায়ের প্রসার। যেটা কমেনি সেটা হলো টিকে থাকার জন্য আমাদের নিয়ত সংগ্রাম। ব্যাবিলন পরিবার যুদ্ধ করে চলেছে– টিকে থাকার, মাথা উঁচু করে টিকে থাকার লক্ষ্যে।

এই আপাত অশুভ বছরে ব্যাবিলন পরিবারে জন্ম নিয়েছে নিউজেন টেকনোলজি লিঃ (Newgen Technology Ltd.) নামে সফট্ওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানটি। কঠিন সময়ে জন্ম নেয়া শিশু প্রতিষ্ঠানটি তার কচি কিন্তু সবল হাত–পা নেড়ে দ্রুত বেড়ে ওঠার অঙ্গীকার জানান দিচ্ছে– আমরা সবাই উৎসুক ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছি তা।

রানা প্লাজার ধ্বংসস্তুপ থেকে কোন ফিনিক্স আকাশে উড়ে গিয়েছিলো কিনা জানিনা, কিন্তু হাজারোর্ধ্ব খেটে খাওয়া মানুষের আত্মাহুতি একেবারে বিফল যায়নি তা বলতে পারি। দেশের সরকার, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর সমিতিসমূহ, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন মিডিয়া, বিদেশি ক্রেতা ও তাদের প্রতিষ্ঠান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিশ্বের সকল দেশ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে আমাদের দিকে, সাহায্যের অঙ্গীকার করেছে। সবাই চেষ্টা করছে কি করে বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সর্ববৃহৎ শিল্পটিকে অসহায় ও রুগ্ন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। যদিও সব চেষ্টার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান এই শিল্পের আপামর মালিকদেরই। অন্যদের সব আন্তরিক চেষ্টা–সহযোগিতাই বিফল হবে যদি আমরা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকরা সর্বাগ্রে ঐ লক্ষ্যে হাত না বাড়াই।

এ বছরটিতেও সামাজিক দায়বদ্ধতার চলমান কার্যক্রমে আমরা ছেদ পড়তে দেইনি। শীতবস্ত্র বিতরণ, শিক্ষাবৃত্তি, নানাবিধ শ্রমিক কল্যাণ ও সফ্টিসহ (Softy) চলমান সকল নিয়মিত চর্চার পাশাপাশি নূতন উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। আমাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন সফ্টিকে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর কাছে সুলভে পৌঁছে দেয়ার প্রয়াসে সফ্টি এক ধরনের সমঝোতা চুক্তি (MoU) স্বাক্ষর করেছে– গ্রামীণ ফেব্রিক্স এন্ড ফ্যাশন্স লিঃ (Grameen Fabrics & Fashions Ltd.) এর সঙ্গে।

রানা প্লাজায় আহতদের জন্য সাধ্যমতো আর্থিক ও বস্তু সাহায্য পাঠাতে দেরি করিনি আমরা।

আশুলিয়ায় নির্মীয়মাণ আহ্সানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হসপিটালে প্রতিশ্রুত ৭০ লক্ষ টাকা নগদ অনুদানের বিপরীতে এবছর মোট ৪৫ লক্ষ টাকা চেক বাবদ প্রদান করা হয়েছে। দেশের সর্ববৃহৎ ও সর্বাধুনিক ক্যান্সার চিকিৎসার হাসপাতালে সাধ্যমতো এগিয়ে আসতে পেরে ব্যাবিলন কর্তৃপক্ষ আনন্দিত।

উল্লেখযোগ্য আরেকটি সমাজসেবামূলক কাজের সাথে গ্রুপকে যুক্ত করতে পেরে ব্যাবিলন পরিবার নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করছে। ঢাকার উত্তরাঞ্চ ৯ নং সেক্টরে ৭০ দশকে এক ক্যানাডিয়ান বিদেশিনি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ফ্যামিলিস ফর চিল্ড্রেন (FFC) এর পাশে আমরা দাঁড়িয়েছি আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত শিশু, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে আশ্রয় প্রদান ও লালনপালনের ভার নিয়ে আসছে। এক ভিনদেশি দরদী মহিলা ও আমাদের দেশের কিছু মহৎহৃদয় মানুষের যৌথ সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটি চলে আসছে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে শিশু সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও নানাখাতে খরচ উর্ধ্বমুখী থাকার কারণে প্রতিষ্ঠানটির স্থানীয় ব্যবস্থাপনা সদস্যবৃন্দ আশ্রিত শিশু-বালক-বালিকাদেরকে নিয়ে এক অনতিক্রম্য কঠিন সময় পার করছিলেন। এমন এক ক্রান্তিকালে ব্যাবিলনকে পাশে পেয়ে FFC ব্যবস্থাপনা অনেকটাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছেন এখন। আমরা সাধ্যমতো সবসময় ওদের পাশে থাকতে চাই-এটি আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

ব্যাবিলন কথকতার লেখক-লেখিকাদের উদ্দেশ্যে এবার তেমন কিছু বলার নেই। গত ক'সংখ্যা থেকেই আমরা মানসম্মত পর্যাপ্ত লেখা পেয়ে যাচ্ছি। বর্তমানে ব্যাবিলনের ব্যবসায়িক দুর্দিন চললেও আমাদের প্রিয় বার্ষিকীর কিন্তু চলছে সুদিন। নূতন প্রত্যাশাও দেখতে পাচ্ছি সামনের দিনগুলোর জন্য।

৭ম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচনে প্রখ্যাত কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। ওঁর অসাধারণ শুভেচ্ছা বক্তব্য এখনো আমাদের কানে বাজে। এই সংখ্যাতে তাঁর চমৎকার বাণী থাকলো আমাদের সামনে পথ চলায় প্রেরণা যোগাবার জন্য। ধন্যবাদ সেলিনা আপা। আমরা কৃতজ্ঞ।

জনাব রডনি রীডের (Rodney Reed) কথা একটু না বললেই নয়। ব্রিটিশ রডনি রীড অনেক আগেই আধা বাংলাদেশি হয়ে গেছেন। তার সাথে তিনি মিশে গেছেন ব্যাবিলনের আত্মার সাথেও। আমাদের সুখে-দুঃখে রডনি রীড অবধারিতভাবে আমাদের একজন হয়ে যান। এবারের সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের জন্য তিনি এক চমক রাখতে যাচ্ছেন। অপেক্ষায় থাকুন।

মাহমুদ! মাহমুদ আলম সিদ্দিকি। এবারের সংখ্যায় সম্পাদকের কাজ সে যেভাবে লঘু ও সহজ করে দিয়েছে, সেই ধারা অব্যাহত থাকলে সম্পাদক সাহেব সহসাই তার আসন হারাবেন মনে হচ্ছে। মাহমুদকে সস্নেহ ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। প্রচ্ছদ শিল্পী স্বাধীন খান, অলংকরণে ফারহানা, মাহমুদ, আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ, কম্পোজ এবং প্রুফ রিডিংয়ে জেভিয়ার বিপ্লব দাস ও আরিফ হোসেন-এদের অবদান, আন্তরিক ও নিরলস শ্রম ব্যতিরেকে এই সংখ্যাটি সময়মতো প্রকাশ করা যেতোনা। এ বক্তব্য ভবিষ্যৎ সংখ্যাগুলোর জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য। এদের কাজের মূল্যায়ন পাঠক-পাঠিকারাই করবেন। তবে আমি তাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদটি এখনই জানিয়ে রাখি।

কথকতার সকল কলাকুশলীসহ ব্যাবিলনের পরিচালকবৃন্দ, গ্রুপের সকল প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক ভাই-বোনদেরকে জানাই মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। ২০১৪ সাল পোশাকশিল্পের জন্য হানাহানি ও অন্তর্ঘাতমুক্ত, আপদহীন হোক, দেশ তথা পৃথিবীর জন্য সুখকর, মঙ্গলময় ও লাভজনক হোক এই কামনা করে শেষ করছি।

এমদাদুল ইসলাম
সম্পাদক

ডিসেম্বর ১৫, ২০১৩ইং

‘কত হাজার মরলে পরে মানবে তুমি শেষে...’

মোহাম্মদ হাসান
জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন)
ব্যাবিলন গ্রুপ

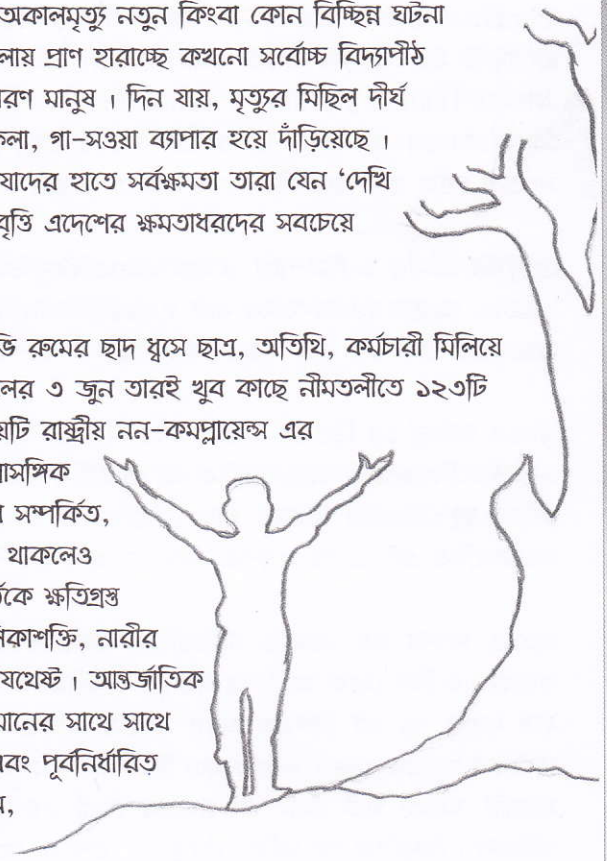

বাংলাদেশে ভবন ধ্বসে কিংবা অগ্নি-দুর্ঘটনায় ‘আশরাফুল মাখলুকাতের’ অকালমৃত্যু নতুন কিংবা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং নিয়মিত বিরতি দিয়ে সর্বমহলের অবহেলার মধ্য দিয়ে অবেলায় প্রাণ হারাচ্ছে কখনো সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ প্রাচ্যের অক্সফোর্ডের ছাত্র, কখনো সর্বহারা শ্রমিক, কখনোবা অতি সাধারণ মানুষ। দিন যায়, মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। আজকাল দুর্ঘটনা যেন কোন ঘটনাও নয়। হেলাফেলা, গা-সওয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাদের করার ক্ষমতা সীমিত তারা সীমাহীন ‘টক শো’ আলোচনায় ব্যস্ত, যাদের হাতে সর্বক্ষমতা তারা যেন ‘দেখি না কি হয়’ দর্শনে আশ্রিত। বাঙালির ভুলে যাওয়া গুণ এবং সর্বংসহা প্রবৃত্তি এদেশের ক্ষমতাধরদের সবচেয়ে বড় সুবিধা দিয়ে রেখেছে।

১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের টিভি রুমের ছাদ ধ্বসে ছাত্র, অতিথি, কর্মচারী মিলিয়ে ৩৯ জনের মৃত্যু, ৩০০ জনের আহত হওয়ার ঘটনা কিংবা ২০১০ সালের ৩ জুন তারই খুব কাছে নীমতলীতে ১২৩টি জীবন্ত মানুষের (যাদের অধিকাংশই মহিলা ও শিশু) অঙ্গার হওয়ার বিষয়টি রাষ্ট্রীয় নন-কমপ্লায়েন্স এর অংশ হলেও আন্তর্জাতিক ব্যবসার সরবরাহ চেইনের নিরীক্ষায় অতটা প্রাসঙ্গিক ছিলোনা। কিন্তু যে শিল্প আন্তর্জাতিক চাহিদা, শর্ত ও আচরণবিধির সাথে সম্পর্কিত, সেই শিল্পের নন-কমপ্লায়েন্স দেশে কতটা নাড়া দেয় সেটা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও আন্তর্জাতিক বিরাগে ব্যবসার ক্ষতি ও হুমকির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর সেই শিল্প যদি হয় দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প, অর্থনীতির চালিকাশক্তি, নারীর ক্ষমতায়নের প্রধানতম প্লাটফর্ম-তখন আতংক উৎকণ্ঠার কারণও থাকে যথেষ্ট। আন্তর্জাতিক ব্যবসা আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখেই করতে হয়। উৎপাদিত পণ্যের মানের সাথে সাথে কর্মক্ষেত্রের মান এবং উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য স্বীকৃত এবং পূর্বনির্ধারিত মান বজায় রাখাটা এ ব্যবসার পূর্বশর্ত। এর ব্যত্যয় মানে শর্তের লংঘন, নিজের সাথে প্রতারণা। ব্যক্তি বিশেষের কর্মফল সমগ্র শিল্পের জন্য ঝুঁকি, দেশের জন্য অমর্যাদাকর আর প্রতিযোগীদের জন্য সুবিধার। তাই জগন্নাথ হল কিংবা নীমতলীর দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার সাথে রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক কারখানায় দুর্ঘটনার ব্যাপ্তিতে, প্রচারণায়, দায়বদ্ধতায় এবং পরিণতিতে ভিন্নতা রয়েছে।

বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাকশিল্পে ভবন ধ্বসে প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে ১১ এপ্রিল, ২০০৫ সালে। স্পেকট্রাম সোয়েটার ফ্যাক্টরীর ঐ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে ৬৪ জন শ্রমিকের, আহত হন ৭৪ জন। দুর্ঘটনার ভয়াবহতায় আজকের রানা প্লাজার সাথে স্পেক্ট্রামের বিশাল অমিল থাকলেও অনেক মিল রয়েছে। ভবন নির্মাণ আইন থেকে শ্রম আইন সবকিছুই ছিলো নিয়মের উল্টো পিঠে। তখনও দেওয়ালের ফাটল শ্রমিকের নজরে এসেছিলো। ঘটনার ৫ দিন আগেই মালিকগণকে জানানো হয়েছিলো। উত্তরে চুপচাপ কাজ করার নির্দেশ এসেছিলো কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। ডোবা ভরাট করে বিল্ডিং তৈরী, ভারী যন্ত্রপাতি ৪র্থ ও ৭ম তলায় স্থাপন, ৪র্থ তলার কাঠামোয় ৯তলা পর্যন্ত নির্মাণ, অন্যদিকে শ্রম আইনের চূড়ান্ত লংঘন ছিলো সুস্পষ্ট। ন্যূনতম মজুরী, সাপ্তাহিক ছুটি, কর্মস্থলে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধান বিষয়ে কিছুই করা হয়নি। শিশু ও কিশোর শ্রমিক নিয়োগ, সারারাত ধরে কাজ - এ সবই ছিল নিয়মের অংশ।

সৌভাগ্যবশত স্পেকট্রামের দুর্ঘটনাটি ঘটেছিলো রাত ১:০০ টার দিকে। না হলে আজকের রানা প্লাজার দুর্ঘটনার ব্যাপ্তি জাতিকে বরণ করতে হতো ২০০৫ সালেই। অথচ Compliance এর তথাকথিত Audit Pass করেই সেখানে মার্কস এন্ড স্পেনসার (M & S) এর মতো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ব্রান্ডের কাজ চলতো।

২০০৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী। KTS Textiles Industries এ বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে উদ্ভুত আগুনের শিখায় প্রাণ হারান ৬১ জন শ্রমজীবী মানুষ(?) এবং আহত হন শতাধিক শ্রমিক। সেখানে ১২ বৎসরের শিশু থেকে ১৪ বৎসরের কিশোর শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হতো। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতির জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থাপনা বা অগ্নি মহড়ার মতো কোন প্রচলন ছিলোনা বরং বের হওয়ার সমস্ত পথ তালাবদ্ধ অবস্থায় রেখে প্রতিষ্ঠানটির মালামালের তথাকথিত নিরাপত্তা বিধান করা হতো। ঠিক তার দু'দিন পর ২৫ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় সবচেয়ে পুরাতন শিল্পাঞ্চল বলে খ্যাত তেজগাঁও এ ৫তলা বিশিষ্ট Phoenix ভবনটি ধ্বসে পড়ে ২২ জনের মৃত্যু ঘটে এবং ৫০ জনের মতো শ্রমিক আহত হন। সেখানে তখন অননুমোদিত সংস্কারের মাধ্যমে উপরের অংশকে একটি বেসরকারী হাসপাতালে রূপান্তরের কাজ চলছিলো। ধ্বসে যাওয়ার সময় সেখানে Phoenix গার্মেন্টস এর একটি লাইনে (কাপড় কাটা থেকে সেলাই পর্যন্ত বিভিন্ন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া) কাজ চলছিলো। সেইদিনই ইমাম গ্রুপের একটি ভবন, যেখানে ৫টি গার্মেন্টস কারখানার (Moon Fashion Limited, Imam Fashion, Moon Textile, Leading Fashion and Bimon Inda garment factories) অবস্থান ছিল–বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণে ৫৭ জন শ্রমিক গুরুতরভাবে আহত হন। বের হওয়ার পথ অত্যন্ত সরু ও মালামালের প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রচুর সংখ্যক লোক এক সাথে নীচে নেমে আসতে পারেনি।

এ দু'টো ঘটনার ৯ দিন পরে ৬ মার্চ ২০০৬ বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাতে ৩ জনের প্রাণহানি ও ৫০ জন শ্রমিকের আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। যেখানে সায়হাম ফ্যাশন্স ছাড়াও আরো দু'টো গার্মেন্টস কারখানা ছিল। অথচ তিনটি কারখানার শ্রমিকদের বের হবার সিঁড়িটি ছিল তৈরী পোশাকের কার্টনে অবরুদ্ধ।

২০১০ সালের ১৪ ডিসেম্বর। রাজধানীর সন্নিকটে আশুলিয়ার হামীম গ্রুপের একটি পোশাক কারখানায় আগুনের ঘটনায় প্রায় ২২ জন নিহত এবং চার শতাধিক আহত হন। একটি গুজবের উপরে ভিত্তি করে শ্রমিকদের সংঘটিত অভ্যন্তরীণ নাশকতা থেকে এই আগুনের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীতে আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের অন্যান্য কারখানাগুলোতে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে। অনাকাংখিত এই ঘটনায় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হন আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের কারখানাগুলোকে লে-অফ করে দিতে।

২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর তারিখটিকে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের ইতিহাসে কালোদিন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ভয়াবহতার দিক থেকে অতীতের সব দুর্ঘটনার রেকর্ড ভঙ্গ করা অগ্নিকান্ডটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মহলের সমালোচনার বিষয় হয়ে দাড়ায়, যা এই শিল্পকে আগে কখনো মোকাবেলা করতে হয়নি। ১১২(?) জন শ্রমিকের মৃত্যু, ২০০ জনের মতো শ্রমিকের গুরুতর আহত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাজরিন ফ্যাশন হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমের শিরোনাম। তাজরিনের ঘটনাটি তখনই ঘটে যখন বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের ভবিষ্যৎ বিষয়ে দুনিয়া জুড়ে নতুন নতুন সম্ভাবনার কথা শুনা যাচ্ছিলো। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে যে আগুনের সূত্রপাত তার লেলিহান শিখা ১৭ ঘন্টায় সব ছাই করে দেয়। আরেকবার প্রমাণিত হয় সরকারী তদারকি আর কমপ্লায়েন্স এর নামে ক্রেতাদের নিজস্ব ও তৃতীয় পক্ষের সব নিরীক্ষার অসারতার কথা। এখানেও অব্যবস্থাপনা আর অপর্যাপ্ততার সেই একই উপাদানসমুহ বিদ্যমান। ৯তলা ভবনে ১৬৩০ জন শ্রমিক/কর্মচারীর জন্য জরুরী বিকল্প সিঁড়ি না থাকা, সিঁড়িতে প্রতিবন্ধকতা থাকা, নিরাপত্তার নামে তালাবদ্ধ করে রাখা– সেই একই বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই তাজরিনের ঘটনায়।

তাজরিন ফ্যাশনের দু'মাসের মধ্যেই ২৭ জানুয়ারী ২০১৩ Smart Export Garments Ltd. নামে ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত আরেকটি কারখানায় আগুন লেগে ৭ জনের প্রাণহানি ঘটে। আশ্চর্যের বিষয় গার্মেন্টসটি নাকি এ শিল্পের কর্তা প্রতিষ্ঠান BGMEA এর সদস্যই নয়। অথচ ইউরোপের বিখ্যাত ক্রেতা– যাদের কমপ্লায়েন্স এর ইস্যুতে শূন্য ছাড়, তাদেরই পোশাক তৈরী হচ্ছিলো এই প্রতিষ্ঠানে। এক্ষেত্রেও অগ্নি নির্বাপক দল কারখানাটিতে তালাবদ্ধতা শ্রমিকদের জোর করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে।

রানা প্লাজা। ২৪ এপ্রিল ২০১৩। শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর শিল্পের ইতিহাসে এমন বিপর্যয় আগে কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন, পোপ ফ্রান্সিস থেকে শুরু করে ILO প্রধান গেই রাইডারসহ সবার দৃষ্টি ছিল সাভার ট্রাজেডির দিকে। মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা কত, জীবিত উদ্ধারই বা কত, তা দিয়ে শিল্পের ক্ষতি নির্ণয় করা যাবে না। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের 'দাসতুল্য' মন্তব্যও হয়তো এক সময় মিলিয়ে যাবে। কিন্তু শাহিনাদের

ক্ষোভ এবং অভিমান মিলাবে কে? 'আমাকে বাঁচাও, তাড়াতাড়ি মুক্ত করো, না পারলে আমার মেয়েটিকে মানুষ করো, আমার মত গার্মেন্টসে পাঠাইও না।' গার্মেন্টসে যে মানুষ থাকে না- শাহিনা মরে গিয়ে প্রমাণ দিয়ে গেল। 'ভিক্ষা করে খাবো, তবুও গার্মেন্টসে কাজ করবো না।' 'না খেয়ে থাকবো, তবুও গার্মেন্টসে আসবো না।' 'জীবনে কেউ যেন গার্মেন্টসে চাকুরী না করে।' 'মাগো তুমি কেন ঢাকায় চাকরী করতে গেলা।' সুমী, শিউলি, পারভীন, শাহিনা ও ময়নাদের এই মন্তব্য অথবা এক এতিম সন্তানের আক্ষেপ আমাদের শিল্প মালিকেরা কি এবার শুনতে পাবে?

টেলিভিশনের পর্দায় স্পষ্ট ছিল শিশু শ্রমিকের মলিন চেহারা, সন্তান প্রসব করার ঘটনা, ভারী যন্ত্রপাতি উপরের তলায় স্থাপন- এ সবকিছুর পরেও কমপ্লায়েন্সের কঠিন বেড়াজাল ডিঙিয়ে নামকরা সব ব্রান্ডের পোশাক উৎপাদন Compliance Audit এর অসারতাকেই প্রমাণ করে। Document সর্বস্ব Compliance Audit, দুর্নীতি নির্ভর সরকারী নজরদারী, মালিকদের অব্যাহত অবহেলায় আর যাই হোক শ্রমিক নিরাপত্তা সম্ভব নয়। মানবিক বিপর্যয় না শ্রমিক বিপর্যয়, দুর্ঘটনা না হত্যাকান্ড, শ্রমিক না দাস এ সব বিষয়ের চেয়ে শিল্প সম্পর্কে শ্রমিকদের নিজস্ব যে অনুভূতি, অভিব্যক্তি এবং অভিমান তার খন্ডন করবে কে এবং কিভাবে?

শ্রমিক সংকটে কাতর যে শিল্প, সেখান থেকে যদি শ্রমিকেরা মুখ ফিরিয়ে নেয়- অন্য কোন শিল্পে আপনি বিনিয়োগ করে আপনার লভ্যাংশ নিশ্চিত করবেন? দেশীয় প্রাচুর্যে অতৃপ্ত মালিকগণ বিদেশী প্রাচুর্যে ডুবে না থেকে আপনার প্রাচুর্যের উৎসভূমি যে শ্রমিক তাদের মনের কথাটি পড়ার চেষ্টা করুন। অন্যথায় তাদের দীর্ঘশ্বাসের উত্তাপ আখেরাতে কেন দুনিয়াতে লেগে যেতে পারে!

সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, মালিক এবং তাদের সহযোগীদের সীমাহীন ঔদাসীন্য, স্বার্থপরতা এবং লোভের কারণে যে দুর্ঘটনা ঘটে তাকে কি শুধুই দুর্ঘটনা বলা চলে, না কি হত্যাও বলা যায়? আর কতজন মরলে তাকে গণহত্যা বলা যায়-সে প্রশ্নটির কোন মিমাংসা হবে কি? নাকি কবির সুমনের মত শুধু আক্ষেপেই পুড়তে হবে-

'কত হাজার মরলে পরে মানবে তুমি শেষে
বড্ড বেশি মানুষ গেছে বানের জলে ভেসে।'

অন্ধকার; আলোয় যাই

মেহেদী হাসান
অফিসার, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

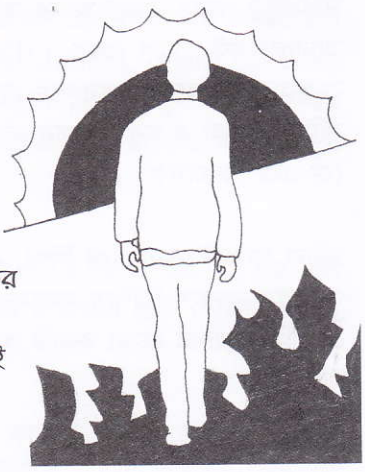

বছর খানেক আগে বিআরটিসি'র একটা বাসে করে বনানী যাচ্ছিলাম। শুরু থেকেই আমার পেছনের সিটে বসা সহযাত্রী ভদ্রলোক তার পাশের জনের সাথে গল্প করছিল বেশ উচ্চস্বরে। এতটাই উচ্চস্বরে যে ব্যাপারটা বিরক্তিকর পর্যায়ের। কিন্তু এখন আর এসবে বিরক্ত হই না, ব্যাপারগুলো সয়ে গেছে। বরং মাঝে মাঝে এর মধ্যে থেকেই মজা নেই। এই যেমন আমার পেছনের ভদ্রলোকের কথাই ধরা যাক–অনর্গল সে তার পাশের ছেলেটাকে নানারকম উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। জানতাম বাঙ্গালি ফ্রিতে উপদেশটা খুব ভাল দিতে জানে। কিন্তু ইনি মনে হয় উচ্চ ডিগ্রিধারী প্রফেশনাল কোন উপদেশদাতা। পেছনে না তাকিয়ে পারলাম না। সৌভাগ্যবান গ্রহীতা সদ্য টিনেজ পেরোনো অল্পবয়স্ক একটি ছেলে। হয়ত সবে উচ্চমাধ্যমিকের গন্ডি পেরিয়েছে। সামনে তার লক্ষ লক্ষ সম্ভাবনাময় দরজা। প্রতিটা দরজার ওপাশে লুকানো সাফল্যের বড় বড় সিঁড়ি। পরামর্শদাতা ভদ্রলোক মূলত সেইসব দরজা একটা একটা করে এই বালকের সামনে খুলে ধরছিলেন আর ভেতরের আলোকচ্ছটার ঝাঁপটা লাগছিল বালকের স্বপ্নভেজা চোখে। আমি শুনছিলাম আর মজা নিচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে ভদ্রলোক যে দরজাটি খুললো তার নাম 'বস্ত্র-প্রকৌশল।' একবার Textile Engineer হতে পারলে আর চাকুরী খুঁজে বেড়াতে হয় না, চাকুরী তখন পেছনে পেছনে ঘোরে, কয়েকদিন পরেই লাখের উপর বেতন- ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুনতে শুনতে কনসেনট্রেশনের ফোকাস কখন যে অতীতে চলে গেল বুঝতেই পারলাম না। ছোটবেলায় 'জীবনের লক্ষ্য' রচনা অনেক লিখেছি। ডাক্তার, প্রকৌশলী, নাসার বিজ্ঞানী, সিক্রেট সার্ভিসের দুঃসাহসী গুপ্তচর–কতবার কতকিছু হয়েছি...। কিন্তু ছন্নছাড়া এই আমার আসলে জীবনের নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যই ছিলোনা। বাসের এই ভদ্রলোকের মত ঠিক এমনি করেই যখন আমার এক সহৃদয় বন্ধু আমার সামনে লক্ষ টাকা বেতনের মুলো ঝুলিয়েছিল, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান হয়ে সে আকর্ষন আমি এড়াতে পারিনি। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এক প্রায় অখ্যাত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বস্ত্র-প্রকৌশল' বিষয়ে ডিগ্রি নিয়েছিলাম। মাঠে নেমে দেখলাম পিচ মোটেও ব্যাটিং সহায়ক নয়। বেড়ার ওপাশ থেকে ঘাসগুলো যত সবুজ মনে হচ্ছিলো, এপাশে এসে ঘাসগুলো আর ততটা সবুজ মনে হচ্ছে না বরং কেমন যেন হলদেটে ভাব। চাকুরী তো পেছনে দৌড়ুলোই না, আমি দৌড়েও ঠিক কায়দা করতে পারলাম না। যাও দু'একটা পাওয়া গেল, প্রস্তাবিত বেতনের কথা শুনে লজ্জা পাওয়া উচিত কিনা বোঝা গেলোনা। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা প্রকৌশলীরা তাও খানিকটা মুলোর নাগাল পায়, আমাদের মতো প্রাইভেটদের সাথে মুলোর দূরত্ব 'পাই' এর মানের মত ধ্রুবক।

লজ্জা এখানেই শেষ না, নিজের মধ্যেও ইদানীং কেমন যেন হীনমন্যতা কাজ করে। আসলে প্রকৌশল বলতে আমি যা বুঝি বস্ত্র-প্রকৌশলের সিলেবাসের সাথে তা কোনভাবেই যায় না। পাবলিক সার্ভিস কমিশন আমাদের জন্য কেন যে প্রফেশনাল ক্যাডার পদ রাখেনি! আমাদের প্রায় একমাত্র ভরসা দেশের পোশাকশিল্প কারখানাগুলো।

RMG সেক্টর আমাদের দেশের অর্থনীতির অন্যতম মূল চালিকাশক্তি। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সর্বপ্রধান খাত। GDP তে এই সেক্টরের অবদান উল্লেখযোগ্য। এই তথ্যগুলো প্রায় আমরা সবাই জানি। সবচে' বড় কথা দুর্বল অর্থনৈতিক অবকাঠামো আর বেকারত্বের সমস্যায় জর্জরিত এই দেশের প্রায় সাড়ে চার মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থান করেছে এই শিল্প। RMG সেক্টর আমাদের জন্য রূপকথার সেই হাস যা প্রতিদিন একটি করে সোনার ডিম দেয়। এই হাসের যত্ন-আত্তি করব, ভাল ভাল খেতে দেব, তা না দায়িত্বসহকারে প্রতিনিয়ত আমরা এর গলা টিপে ধরছি। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, সর্বগ্রাসী দুর্নীতি আর দেশকর্তাদের যথোপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, আমাদের এই অপার সম্ভাবনাময় খাতকে অনিশ্চয়তাময় অন্ধকার টানেলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যে পোশাক শ্রমিকদের ঘর্মাক্ত শ্রম প্রতি বছর আমাদের এতগুলো বৈদেশিক মুদ্রা এনে দেয়, আজ পর্যন্ত তাদের সঠিক ও নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরী করে দিতে পারিনি আমরা। স্পেকট্রাম, ফিনিক্স, তাজরীন ফ্যাশন, রানা

প্লাজা.... ক্রমবর্ধমান এই দুর্ঘটনাগুলো এবং তারই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আমাদের GSP সুবিধা বাতিল কি খাদের কিনারায় পৌঁছারই ইঙ্গিত নয়!!!

হতাশার কথা অনেক হল । অন্ধকারের চেয়ে আলো অনেক সুন্দর । আসুন আলোতে যাই । ব্যক্তিগত জীবনে আমি চরম আশাবাদী একজন মানুষ–ইংরেজিতে যাকে বলে Perfect Optimist. আসুন অপটিমিজমের গল্প শুনি.... । আমার নিজস্ব কিছু না, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম থেকে নেয়া একটা গল্প, একটা আইডিয়া শেয়ার করছি মাত্র ।

আমেরিকান টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ডেভিড লেটারম্যানকে মনে হয় আমরা অনেকেই জানি । এই ভদ্রলোকের নাকি তার কোন সহকারীনির সাথে যৌন সম্পর্ক ছিল । এই ভয়াবহ তথ্য আর তার প্রমাণ নিয়ে ২০০৯ সালে এক ব্যক্তি তাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করে; ভয় দেখায় দুই মিলিয়ন ডলার না দিলে সে মিডিয়ার কাছে এই প্রমাণ দিয়ে দেবে । সাধারণত এই অবস্থায় মানুষ গিভ ইন করে মানসম্মান বাঁচায় । কিন্তু লেটারম্যান কি করেছিল জানেন? তিনি তার শোতে প্রথমে তামাশা করলেন যে, আমি এতোই খারাপ যে আমার এ্যাসিস্টেন্ট এর সাথে আমার যৌন সম্পর্ক ছিল । তারপর আরেকটু তামাশা । তারপর ক্ষমা প্রার্থনা তাও কৌতুকের ঢঙে । মাঝখান দিয়ে ব্ল্যাকমেইলকারীর তো টাকা পাওয়া হলোই না, উল্টো জেলে যেতে হলো ছয় মাসের জন্য । অবাক ব্যাপার হলো প্রকাশ্যে নিজেকে নিয়ে ফাজলামি করায় তার জনপ্রিয়তা বেড়ে গেলো ।

মহাবিপদে বেশিরভাগ মানুষ করণীয় ভুলে যায়, জিনিয়াসরা বিপদ কাটিয়ে ওঠে, কিন্তু অ্যাবসলিউট জিনিয়াসরা এই মহাবিপদটাকেই লঞ্চিং প্যাড বানাতে পারে ।

ডক্টর মুহম্মদ ইউনুস যে অ্যাবসলিউট জিনিয়াস এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই । তিনি যে সাভার ট্র্যাজেডির মতো মহাবিপর্যয়কে বাংলাদেশের RMG সেক্টরের জন্য লঞ্চিং প্যাড বানানোর দুঃসাহস দেখিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসা করার মতো । এটা ঠিক যে ডক্টর মুহম্মদ ইউনুস ইদানীং একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব এবং বিতর্কটা রাজনৈতিক বিভাজনের পর্যায়ে চলে গেছে কিংবা কেউ কেউ হয়তো তার এই প্রস্তাবে ব্যক্তিগত স্বার্থের গন্ধ পাবে তবুও এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে তার প্রস্তাবটা একটা গেম চেঞ্জার প্রপোজাল । আমি ভেবে পাইনা বাংলাদেশের মেইনস্ট্রিম মিডিয়ায় কিভাবে ব্যাপারটা অনালোচিত রয়ে গেল ।

আর প্রস্তাবটা ছিল এরকম যে, ধরা যাক তিরিশ ডলারের একটা শার্ট, তার পঞ্চাশ সেন্ট যাবে পোশাক শ্রমিক কল্যাণ ফান্ডে । যেটা যাবে গ্রামীণ বা ব্রাক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে । স্থূল দৃষ্টিতে এটা শুধুই একটা মানবিক প্রস্তাব কিন্তু স্ট্রাটেজিক মার্কেটিং এর দৃষ্টিকোণে বিচার করলে এর প্রভাব অকল্পনীয় ।

ধরুন আপনি আমেরিকান, বৃটিশ কিংবা অস্ট্রেলিয়ান । একটা শার্ট কিনতে গেলেন । শার্টের ট্যাগের সাথে আরেকটা ট্যাগ । রঙটা সবুজ, তার মধ্যে লাল একটা বোতাম । সেখানে লেখা 'আপনি এই শার্ট কিনে অমুক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের পোশাকশ্রমিক কল্যাণ ফান্ডে পঞ্চাশ সেন্ট দিলেন ।' আপনি এই শার্ট কিনে তখন আর শুধুমাত্র ক্রেতা থাকলেন না, হয়ে গেলেন বর্ডারলেস গ্লোবাল ভিলেজের একজন রেসপন্সিবল কনজিউমার । ক্রেতা ভাবছেন এই শার্ট কিনে আসলে তিনি দরিদ্র শ্রমিকদের সরাসরি উপকার করছেন, শোষন করছেন না । বাংলাদেশ যদি এই পঞ্চাশ সেন্টের এপ্রোপ্রিয়েট মার্কেটিং করতে পারে তাহলে এথিক্যাল কনজিউমারিজমের ইতিহাসে এটা মাইলফলক হয়ে থাকবে । এই একটা স্টিকারের শক্তি যে কি অভাবনীয় তা কি একবার ভেবে দেখেছেন? শুধুমাত্র একটা স্টিকারের জন্য হাজার হাজার ব্রান্ড বাংলাদেশে আসবে । তাদের কাছে পঞ্চাশ সেন্টের চেয়ে বেশী গুরুত্ব পাবে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির তকমা । প্রপার ক্যাম্পেইনিং করতে পারলে এই স্টিকারটা হতে পারে বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম মিলিয়ন ডলার ব্রান্ড ভ্যালুর ইমেজ । হয়ত আফ্রিকার অনেক দেশ, ভারত, পাকিস্তান কিংবা ভিয়েতনাম আসবে কমিশনের বিনিময়ে তাদের দেশে এই শ্রমিক কল্যাণ ফান্ডটা চালাতে ।

খাদের কিনারায় থাকা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অবস্থা আর দশ–পনের বছর পর কেমন হবে তা নিয়ে যে বিশেষজ্ঞরা (!) টক শোতে ঝড় তোলেন, তারাই হয়ত ভাল জানেন (যদিও তাদের আলোচনায় আমি আবার মাঝে মাঝে অন্য গন্ধ পাই)। আমি তাদের মত অখন্ড যুক্তি এবং অখন্ড পাল্টা যুক্তি দিয়ে নয়, আমি আমার বিশ্বাস থেকে বলছি–যারা ভাবছেন এই অন্ধকার টানেলের অন্য পাশে আলো নেই তারা ভুল ভাবছেন । আলো আসছে– আলো আসবেই ।

পুনশ্চ– সংশ্লিষ্টরা ইউনুস সাহেবের প্রস্তাবটা ভেবে দেখবেন ।

মাগো তোমায় মনে পড়ে

মোঃ নূর আলম
সিনিয়র অফিসার, প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

মাগো তোমায় মনে পড়ে
সারাদিন সারাক্ষণ,
তোমার কথা ভেবে সারা
আমার এই ছোট্ট মন ।

তুমি যখন আদর করে
দিতে মাথায় হাত,
মনটা তখন ভরে যেতো
কাটতো সুখে রাত ।

কখনও যদি আহার বিনে
যেতাম গভীর ঘুম,
তুমি তখন তুলতে ডেকে
দিয়ে আদর চুম ।

এখন মাগো তোমায় ছেড়ে
থাকি আমি ঢাকা,
মন চাইলেও সকাল সাঁঝে
পাইনা তোমার দেখা ।

কাজের শেষে রাতে যখন
মোবাইলে হয় কথা,
মনটা তখন যায় ভরে যায়
থাকে না কোনো ব্যথা ।

আমার কথা

এ এইচ এম সামিউল বাশার রাজা
অফিসার, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

হ্যা, আমি ভালো আছি
অফিসের কর্মমুখরতা
অফিস শেষে কিছুটা আড্ডা এবং
জীবনের বাকি আনুষঙ্গিক 'ইত্যাদি' ও 'প্রভৃতি' মিলিয়ে
আমি ভালোই আছি....
মাঝে কেবল সময়েরই অভাব ।
অথচ চারিদিকে এত প্রাণের ছোঁয়া....
হুট করে তাই জীবনটাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে ।
'নিভন্ত এই চুল্লিতে' যদি কেউ আর একটু আগুন দেয়
হয়তো আরো কিছুটা দিন এই পৃথিবীতে বাঁচতে ইচ্ছে করবে
তাও সেই নেহাত স্বভাবেই....
হয়তো স্বার্থপরের মতো আরো কিছুটা পেতে ইচ্ছে করবে ।
আর....
ইচ্ছে করবে চুপি চুপি...
প্রতিরাতে কিছুটা সময় আয়নায় চোখ পড়ে,
ওজন বেড়েছে
বেড়েছে বয়সটাও.... (অংকের হিসাবে ৩ মাস ১৭ দিন)
বেড়ে চলেছে জীবনের চাহিদা...
কমেছে মাথার চুল...
সময়
আর ভালোলাগার ক্ষমতা ।

সালাদ

এস এ এম ফারুকুজ্জামান
মার্কেটিং ম্যানেজার
ব্যাবিলন এগ্রিসায়েন্স লিমিটেড

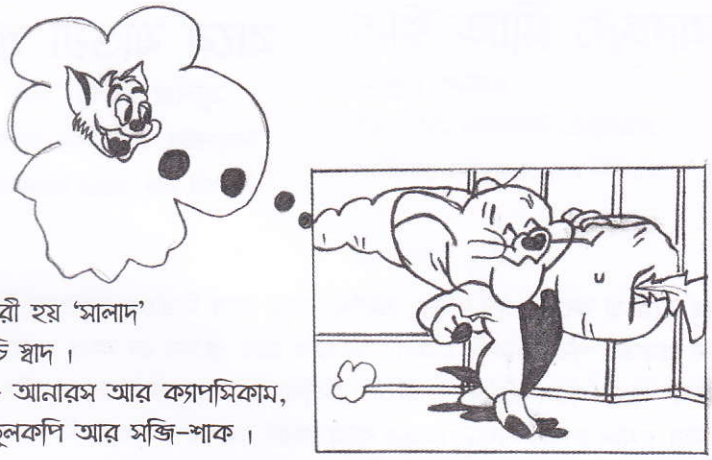

একক কিংবা সমাহারী টাটকা-কাঁচা-সব্জি মিলে তৈরী হয় 'সালাদ'
মৌসুম ভেদে সংগ্রহ হবে - মিলবে পুষ্টি, বাড়বে রুচি স্বাদ।
গাজর, পেঁপে, বিনস্, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা- পিয়াজ- আনারস আর ক্যাপসিকাম,
লেটুস পাতা, ধনে পাতা, শশা-লেবু, আদা-রসুন, ফুলকপি আর সব্জি-শাক।

সালাদের মাঝে ভিটামিন-সি, ক্যারোটিন, ক্যালসিয়াম ও আয়রন,
ফাইটো নিউট্রিয়েন্ট; আরও থাকবে বেশি এন্টি-অক্সিডেন্ট।
ফাইবার-এ, ফলিক এসিড; সামান্য মিশ্রিত অলিভ অয়েল কলেস্টরেল কমায়,
ভিটামিন-ডি; ই-কে, পুষ্টি গুণে ভরপুর, উপকারী- ক্যালরী কম থাকায়।

হাড় করে শক্ত, মন থাকে আটুট, বেড়ে উঠে তৃপ্তি-মাসেলের শক্তি,
খেলোয়ার-জনসাধারণ, গর্ভবতী মায়ের প্রেসার কিংবা চোখের জ্যোতি,
ডায়াবেটিস কিংবা হার্টের রোগীর অন্ধত্ব কমায়, রোগ প্রতিরোধ বাড়ায়।
সালাদ খেলে নিয়মিত, আয়ু বাড়ে সকলেরই, বার্ধক্যও কমায়।

সব বয়সের রোগী কিংবা সুস্থ্য সবারতরে, সালাদ রাখুন ঘরে,
মহিলাদের লাবণ্য বাড়ায়, ত্বকের মিনারেলও অধিক বাড়ে।
যুব-বৃদ্ধ সবাই স্বাধীন, সালাদ খেতে বাধাহীন-
সব নাগরিক থাকলে সবল, দেশ চলবে বিরতিহীন।

প্রতিদিনের প্রতিবেলার খাবার মেনুতে পুষ্টিবিদদের মতে,
সকল প্রকার সব্জি সহায়, চর্বিমুক্ত করতে আবার হজম শক্তিতে।
উঠান আঙ্গিনা কিংবা বাড়ির ছাদে সব্জি ফলাই ভক্তিতে,
ভাত রুটি কম খেয়ে-নিত্য নতুন সালাদ খাই ফুর্তিতে।

ঢাকা শহর

মোঃ এরশাদুল হক
জুনিয়র সুপারভাইজার, কাটিং
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

এত বড় শহরটার
নাম দিলো কে ঢাকা,
সারা শহর ঘুরে দেখি
একটুও নাই ফাঁকা।

শহর জুড়ে দালানকোঠা
পথ জুড়ে তার গাড়ি,
ধূলা-ধোঁয়ায় ত্যক্ত জীবন
আছে ছিনতাইকারী।

অজু-গোসল শেষ না হতেই
বন্ধ কলের পানি,
এই শহরে বসবাসটা
বড্ড কঠিন জানি।

ঝরে যাওয়া স্বপ্ন

জুলিয়া আলম জলি
ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি কন্ট্রোল
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

দু'চোখ ভরেতো কতোই স্বপ্ন ছিলো, একদিন তার মেয়ে বিথীকে লেখাপড়া শিখিয়ে স্কুলের মাস্টার আপা বানাবে। সামান্য একজন গার্মেন্টসকর্মী কমলা। সাভারে রানা প্লাজায় সে কাজ করতো। সুখে দুঃখে তার সংসার ভালোই চলছিলো। ২৪ এপ্রিল ২০১৩। আজও প্রতিদিনের মতো কমলা তার স্বামীর সাথে পান্তাভাত খেয়ে কাজে চলে যায়। মাস শেষ। সামনে বেতন পাবে তারই আশায়। তখনও কি সে জানতো এই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া? দু'চোখের মনি বিথীকে এই তার শেষ দেখা। নিয়তি কতো নিষ্ঠুর, কতো নির্মম। অফিসে ঢুকে সবাই যখন কাজে মগ্ন ছিলো, ঠিক তখনই ধ্বসে পড়লো রানা প্লাজার ভবনটি। হাজার হাজার মানুষ ছিলো ভবনটিতে। কিছু মানুষকে জীবিত আর বেশিরভাগ মানুষকেই মৃত উদ্ধার করা হলো। কি মর্মান্তিক দৃশ্য! পুরো সাভার যেন এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। কাউকে কাউকে জীবিত পাওয়া গেছে। কারো লাশ পাওয়া গেছে। কিন্তু কমলাকে জীবিত পাওয়াতো যায়ইনি, এমনকি লাশও না। দু'বছর বিথীর বয়স। সে তার মাকে খোঁজে কিন্তু মা তো আসেনা। চকলেট, চিপস্ নিয়ে মা আর আসেনা। মা যে আর কোনদিনই আসবেনা এই কথাতো অবুঝ বিথী বোঝে না। সে তার মাকে খুঁজেই চলেছে সবার মাঝে। তাই আজ জাতির কাছে, জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন–এই যে গরীব দুঃখীরা যারা তাদের ছোট ছোট স্বপ্নগুলো নিয়ে এই গার্মেন্টসে কাজ করে, দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের জন্য কাজ করে; যাদের শরীরের ঘাম ঝরিয়ে দেশের অর্থনৈতিক আয় হচ্ছে, সেই শ্রমিকের জীবনের কি কোন মূল্য মিলবে না কোনদিন? যাদের জন্য বিথীর মতো হাজারো শিশু হারিয়েছে তার মাকে–বাবাকে, তাদের কি দিতে পারবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি? পারবে কি শাস্তি দিতে এই দেশের সরকার ঐ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া মানুষরূপী পশুদের?

স্বপ্নাতুর

মাহমুদুল হাসান
জুনিয়র সুপারভাইজার
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড

স্বপ্নীল স্বপ্নের বুনন করে চলেছি
স্বপ্নে বিভোর হয়ে,
স্বপ্ন বুনছি উজ্জ্বল নয়নে
স্বপ্নে স্বপ্নাতুর হয়ে।

স্বপ্ন দেখছি একটি স্বপ্নের
সময়ক্ষেপণ করে,
স্বপ্ন আমায় স্বপ্নবিলাসী করে
স্বপ্নের অমোঘ জালে।

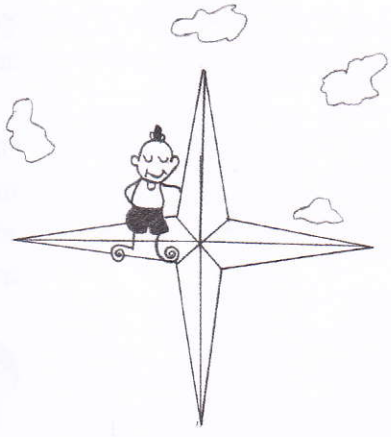

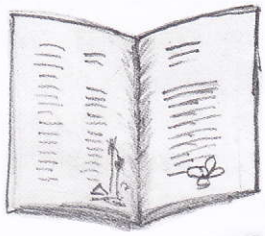

ব্যাবিলন কথকতা

মোঃ জামসেদ আলী
সুপারভাইজার, কোয়ালিটি কন্ট্রোল
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

ব্যাবিলন কথকতা,
শ্রমিক কর্মচারীর
হৃদয়ের কথা।
মনের মাঝে লুকানো স্মৃতি
হাসি কান্না যত ব্যাথা,
শত কাজের মাঝেও ফুটিয়ে তোলা
কৌতুক, গল্প আর কবিতা।

স্মৃতি বিজড়িত ভ্রমন কাহিনী
আকাঙ্খার প্রতিটি পাতা।
তারা লিখেছে লাঞ্চিত অবহেলিত
কোন এক নারীর কাহিনী–
সমাজের কাছে নিপীড়নে ছিল
যে অর্ধাঙ্গিনী।

কবিতার ছন্দে ভরে ওঠে
পাঠকের হৃদয়ের দুকূল,
তাদের অন্তরে ঘুমিয়ে আছে
বিদ্রোহী কবি নজরুল।

মাতৃভূমির যে গ্রামখানি
মনের মাঝে আঁকা।
তারই বিবৃতি দিয়ে
আপনার গল্প লিখা।

আমাদের কাব্য আমাদের কথা,
আমাদের ব্যাবিলন কথকতা।

In Memory of Tazrin's and Rana Plaza's Victims

তাই আমি দেবদাস

আব্দুল কাদের
ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি এ্যাস্যুরেন্স
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

ভালবাসার মূল্য দিতে
হৃদয় ভাঙে যার,
সেই জানে গো কিসের অনল
পোড়ায় বারেবার।

স্বপ্নে ভরা দু'টি আঁখির
শ্রাবণ মেঘের ঢল,
পায়না খুঁজে বাঁচার মানে
ঝরায় শুধু জল।

হাসি মাখা মুখের ভাঁজে
দুঃখ আঁকে ছবি,
বিশ্বাস হয়না মমির পুতুল
অবিশ্বাস হয় স'বি।

ঘোর কাটেনা হতাশ মনের
চাঁদ লাগেনা ভালো,
অন্ধকার হয় পথের দিশা
তিমির লাগে আলো।

রাতের সাথী দুঃস্বপ্ন
নির্ঘুম যায় রাত,
দিনের আলো ভীষণ কালো
শূন্য ভবিষ্যৎ।

বুকের ভিতর রক্তক্ষরণ
পাঁজর ভাঙ্গা ঢেউ,
মনের আশা রইল মনে
বুঝলোনাতো কেউ।

ভালবাসার পরশে মোর
জীবন সর্বনাশ,
গোঁফ দাড়িতে বিবর্ণ মুখ
তাই আমি দেবদাস।

In Memory of Tazrin's and Rana Plaza's Victims

অন্ধকারে আলো

কাজল কান্তি দাস
ম্যানেজার, মার্কেটিং এন্ড মার্চেন্ডাইজিং, ওভেন টপস্
ব্যাবিলন গ্রুপ

আজ ১৮ আগস্ট ২০০৯, নীড়ের জন্মদিন। দেখতে দেখতে চার বছর হয়ে গেল। সেই নীড় এখন অনেক দুরন্ত, এক পলকের জন্য এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। যখনি সে নিশ্চুপ, বুঝতে হবে কোথাও না কোথাও কোন কিছু সে করছে যেটা তার করার কথা না।

'ভাদাইম্মা' একটি আঞ্চলিক শব্দ। মা প্রায়ই আমাকে এ কথাটি বলতেন। যার আক্ষরিক অর্থ মনে হয়, যে কখনো নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেনা। বর্তমান নিয়ে খুশি। কথাটার কিছুটা মানে খুঁজে পেলাম ২০০৯ সালের শেষার্ধে।

ডাক্তার আর ঔষধ আমার জীবনের তালে চলেনা। আমি বরাবর এড়িয়ে চলতাম এই শব্দগুলি। ১৭ আগস্ট সকালে লোপাকে (আমার সহধর্মীনি) নিয়ে এলাম উত্তরার আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। যথারীতি ডাক্তারের উচ্চস্বর- কেন এত দেরি করলাম। ১৮ আগস্ট আমাদের পরিবারে নতুন মুখ এলো। নাম রাখা হলো নীড়।

দেখতে দেখতে ২৬ দিন চলে গেলো। লোপার অভিযোগ চলতে লাগলো- নীড় রাতে অনেক কান্না করে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। আমিও আমার অভ্যাসবশত বলতে লাগলাম- ছোট্ট শিশু একটুতো কান্না করবেই, ঠান্ডার সমস্যা হবে হয়তো তাই শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একদিন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম।

'আপনার বাচ্চার অবস্থা ভীষণ খারাপ, ওর হার্টের সমস্যা আছে, আপনি দেরি না করে এখনি এনআইসিইউ (NICU) তে ভর্তি করে দিন।' ডাক্তারের কথায় প্রতিবাদ বা অবহেলা করার মতো শক্তি ছিলোনা আমার। সেদিন ছিলো নীড়ের ২৬তম দিন। বিকেল বেলা হাসপাতাল থেকে মোহাম্মদপুরের এক ডাক্তারের ঠিকানা দেয়া হলো আলট্রাসনো করার জন্য। শিশুদের জন্য ডাঃ আজিজ নাকি সবচেয়ে ভালো। নীড়কে নিয়ে ডাঃ আজিজের চেম্বারে গেলাম। 'ওর হার্টে একটা ছিদ্র দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই। অনেক বাচ্চার এরকম সমস্যা থাকে যেটা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে নরমাল হয়ে যায়। কিন্তু আমার কাছে আরেকটা ব্যাপার দৃশ্যমান হয়েছে তা হলো Contraction of Arota (সংকুচিত রক্তনালী)।' ডাঃ আজিজ আরো বললেন, রক্তনালী সংকুচিত হবার কারণে হৃৎপিন্ড থেকে শরীরে রক্ত চলাচল অনিয়মিত হচ্ছে। আপনি স্কয়ার অথবা ইউনাইটেড হসপিটালে যোগাযোগ করতে পারেন যদি রোগীর অবস্থার অবনতি হয়।

আস্তে আস্তে আমার মন ভয় পেতে শুরু করলো। উত্তরা হাসপাতালে চলে এলাম। রাত ৯টার দিকে এনআইসিইউ'র নার্সদের সাথে কথা বললাম। একজন চুপিসারে বলে গেল যত দ্রুত সম্ভব আমি যেন হাসপাতাল বদল করি কারণ বাচ্চার ভেন্টিলেশন লাগবে এবং তা উত্তরা মেডিকেল হাসপাতালে নেই। বুঝতে পারলাম আমি এক কঠিন সময়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। সাথে সাথে ইউনাইটেড ও স্কয়ার হসপিটালে যোগাযোগ করে রোগীর অবস্থা জানিয়ে ওদের সাহায্য চাইলাম। রোগী নিতান্তই ছোট হবার কারণে হাসপাতালের উচ্চ পর্যায়ের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ১১টা ৩০মিঃ পার হয়ে গেল। আমার মোবাইল বাজল না। অনোন্যপায় ডাঃ আজিজ (যিনি বিকেল বেলা আলট্রাসনো করেছিলেন) কে ফোন দিলাম। উনি আমাকে সরাসরি স্কয়ারে চলে যেতে বললেন, আমাকে এ বলেও আশ্বস্ত করলেন যে উনি হাসপাতালে বলে দিবেন।

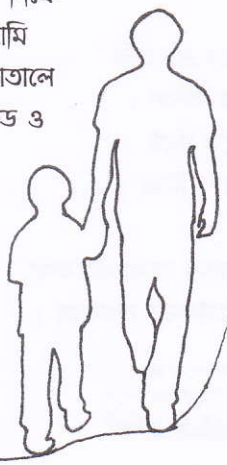

জীবনে প্রথম এ্যাম্বুলেন্সে উঠলাম। নীড়ের নাকে অক্সিজেন, কিছুক্ষণ পর পর

কেঁপে উঠছে তার শরীর আমার হাতের উপর। জীবনের সবচেয়ে বড় একটা কঠিন সত্য আমার মাথায় ঘুরতে লাগল, বাবার কোলে ছেলের মৃত্যু। শরীরের কাঁপুনী বাড়তে লাগল নীড়ের। সোনারগাঁও হোটেলের সামনে রাত ১২টায়ও যানজট। লোপা যেন স্থবির হয়ে গেছে। ওর মুখে কোন কথা নেই, কেমন যেন নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছে নীড়ের দিকে। রাত ১টা ৫মিনিটে স্কয়ার হসপিটালে পৌঁছে গেলাম। আমাকে বলা হলো রিসিপশন থেকে নীড়ের ফাইলটা রেডি করে নিয়ে আসার জন্য। আমার সামনে দুইজন লোক আছে ওদের রোগীদের নতুন ফাইল করার জন্য। কিন্তু রিসিপশনের বোধ হয় তেমন কোন ব্যস্ততা নেই। 'আমার রোগীর অবস্থা অনেক খারাপ, আমাকে একটু ফাইলটা রেডি করে দিবেন প্লিজ?' আমার কথায় উনি কর্ণপাত করলেননা। একজন নার্স এল ভেতর থেকে। আমাকে দেখিয়ে বললো, 'বাচ্চাটার অবস্থা খারাপ, একটু তাড়াতাড়ি ওর ফাইলটা রেডি করে দিন।' মনে হলো একটু দয়া হলো অফিসারের। কিছুক্ষণ পর আমাকে বিস্তারিত নাম, ঠিকানা ইত্যাদি লিখতে বলল। এর মধ্যে আবার সেই নার্সটি এলো, এবার একটু ধমকের স্বরে বললো, 'তাড়াতাড়ি করছেন না কেন, বাচ্চাটাকে তো বাঁচানো যাবে না।' এবার অফিসারের হুঁশ হলো। একটা ফর্ম প্রিন্ট দিলেন যেখানে লেখা আছে রোগীর নাম, বাবার নাম, জন্ম তারিখ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নাম। অতি জরুরী কাগজটা স্কয়ারের একটা ফাইলে পিন মেরে দিলেন।

এনআইসিইউ'র কর্তব্যরত লেডী ডাক্তার পূর্বের রিপোর্টগুলি দেখার পর আমাকে অনেকটা ধমকের সুরে বললেন, 'এত দেরি করলেন কেন, ওর সমস্ত শরীর হলুদ হয়ে গেছে, জন্ডিসের মাত্রা বেশী'। আমি উনাকে আলট্রাসনো রিপোর্টটা দেখতে বললাম। 'এই বাচ্চাকে বাঁচানো যাবেনা, আমরা দেখি কি করতে পারি, অনেক দেরি হয়ে গেছে'- রিপোর্ট দেখার পর ডাক্তার বললেন। উত্তরার সেই কর্তব্যরত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আমি নীড়ের জন্য ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করতে বললাম। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত নীড়কে ভেন্টিলেশনে রেখে আমি আর লোপা বাইরে বের হয়ে এলাম। এনআইসিইউ'র সামনের সোফাতে অনেক লোক বসা, বুঝলাম ওরাও আমাদের মতো। আস্তে আস্তে সবার সাথে পরিচয় হলো। জানতে পারলাম ওদের বাচ্চাদের কোন না কোন সমস্যা আছে।

পরদিন সকালে ডাক্তার এলেন, যাবার সময় জিজ্ঞেস করলাম রোগীর অবস্থা। '৩...ও নীড়, গতকাল রাতে যে বাচ্চাটা এসেছে আপনি ওর বাবা? এখন কিছু বলা যাবেনা। পর্যবেক্ষণে আছে, আমরা চেষ্টা করছি।' তিনদিন অতিবাহিত হয়ে গেল ডাক্তার সাহেবের এই সান্ত্বনার বাণী শুনে।

দশ-বারো বছরের একটা মেয়েকে শরীর ঢাকা অবস্থায় এনআইসিইউ থেকে বাইরে নিয়ে আসা হলো, নাম শম্পা। শম্পার মায়ের বক্তব্য গতকাল দুপুরে মেয়েটার মুখে রক্ত দেখতে পেয়েছেন। ডাক্তারকে বলার পরেও ডাক্তার/নার্স কোন উত্তর দেননি। গতকাল মেয়েটা মারা যায়। ভীষণ কষ্ট হলো নাদুসনুদুস মেয়েটার মুখ দেখে। আর কখনো সে মা ডাকবে না। আমরাও সবার মতো সামনের সোফাতে বসে বসে রাত কাটাতাম, কখনো দুইটা সোফা একসাথে করে ঘুমিয়ে যেতাম।

একদিন রাতে তন্দ্রা কেটে গেল, দেখলাম একজন মহিলা জোরে জোরে কথা বলছে আর কর্তব্যরত গার্ডকে এনআইসিইউ'র দরজা আরেকবার খোলার জন্য অনুরোধ করছে। পরে জানতে পারলাম, বাচ্চার চিৎকারে বাইরে বসা মায়ের ঘুম ভেঙ্গে যায়। দুধ খাওয়ানোর কথা বলে এনআইসিইউ'র ভেতরে প্রবেশ করে উনি দেখতে পান, তার বাচ্চাটা কান্না করছে অথচ নার্সরা ঘুমোচ্ছে। ভীষণ খারাপ লাগল সেবার মান নিয়ে।

ডাঃ আজিজ যিনি স্কয়ারের চিকিৎসক, আবার আলট্রাসনো করলেন কিন্তু সরু রক্তনালীর সঠিক অবস্থানটা জানতে পারছেন না। সিটি স্ক্যান করার পরামর্শ দিলেন, সাথে সাথে সর্তক করে দিলেন এত ছোট বাচ্চার সিটি স্ক্যান করার সময় যেকোন কিছু ঘটতে পারে। এদিকে নীড়ের ব্লাড প্রেসার (BP) অস্বাভাবিক। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো শরীরের উপরের দিকে বিপি ১১০/১৬০, পায়ের দিকের বিপি ৩০/৪০। বুঝতে পারছিলামনা কি করব। স্কয়ার রিপোর্টগুলির ফটোকপি দিতে চাইলো না, অগত্যা পূর্বের রিপোর্টগুলি নিয়ে এ্যাপোলোতে একজন শিশু সার্জনের সাথে দেখা করলাম যিনি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি উপদেশ দিলেন দেশের বাইরে চলে যাবার। কিন্তু ইমার্জেন্সি হলে এ্যাপোলোতে ওপেন হার্ট সার্জারি করা যাবে। চলে এলাম ইউনাইটেড হসপিটালে, প্রায় অভিন্ন বক্তব্য ছিল ওখানে। ল্যাব এইডের ডাঃ নুরুন নাহার বললেন ইন্ডিয়া চলে যাবার জন্য। সেন্ট্রাল হসপিটালের ডাঃ সুজিত, হকসন্স'র ডাঃ অশোক ধরও পরামর্শ দিলেন দেশের বাইরে চলে যাবার।

মায়ের 'ভাদাইম্মা' কথাটার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারলাম, কারণ আমার অনেক টাকার দরকার। ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না সেসব বন্ধুদের, আত্মীয়-স্বজনদের যারা টাকা পাঠিয়েছিল হসপিটালে। আমার পরিবারতো ছিলোই।

৫ম দিন শেষে ডাক্তার জানালো, নীড়ের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হচ্ছে । ডাঃ আজিজের সাথে আবার দেখা করলাম, উনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, আমার কি করা উচিৎ । যার তত্ত্বাবধানে নীড় চিকিৎসাধীন ছিল, সেই ডাক্তারের চেম্বারে গেলাম, যথারীতি নতুন করে এপয়েনমেন্ট নিতে হলো । অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলাম নীড়ের হার্টের ছিদ্রগুলির কথা, রক্তনালীর সংকীর্ণতার কথা । 'আমরা দেখছি কি করা যায় । অনেক ছোট বাচ্চাতো কোন কিছু ঠিক করে বলা যাচ্ছে না ।' অনেকে হাসপাতালে এলো সাহস দেবার জন্য । এই বাচ্চা বাঁচবে না, বাঁচলেও সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাবে, এমন অনেক মন্তব্যও কানে এলো ।

দিনের আলো কখন দেখেছি মনে পড়ে না । ১০ দিন কেটে গেল । নীড়ের অবস্থার তেমন কোন উন্নতি নেই । কখন যে ঈদ কেটে গেল, বুঝতে পারলাম না । এনআইসিইউ তে নীড়কে দেখতে যেতে চাইতাম না কারণ দুই হাতে Canola লাগানো ইঞ্জেকশন দেবার জন্য, ছোট একটা কাঁচের ঘরে শুয়ে আছে, চারদিকে কয়েকশ পাওয়ারের লাইট জ্বলছে । নীড়ের মতো আরো অনেক বাচ্চা আছে একই অবস্থায় । নিতান্তই প্রয়োজন না হলে এনআইসিইউ' ভিতরে প্রবেশ করতাম না ।

কুমিল্লায় ফোন করে মেঝ ভাইকে দায়িত্ব দিলাম নীড় আর নিশার পাসপোর্ট বানাতে । বলাই হয়নি নিশা আমার বড় মেয়ে, বয়স তখন চার বছর এক মাস । মনে মনে স্থির করে নিলাম কপালে যা আছে ব্যাঙ্গালোরে ডাঃ দেবী শেঠীকে দেখাতে যাবো ।

নীড়ের বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাজ এর সাথে আরেকবার কথা বললাম । কিন্তু কোন উত্তর পেলাম না যা থেকে মনকে সান্ত্বনা দেয়া যায় । অনেকটা জোর করে নীড়কে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এলাম । ভরসা ছিল ডাঃ আজিজের সাহস, নীড় তিন চার ঘন্টা ফ্লাই করতে পারবে । বিপি কমানোর জন্য ঔষধ দেয়া হলো । বিশাল অংকের একটা বিল পরিশোধ করে নীড়কে নিয়ে স্কয়ার থেকে বের হয়ে এলাম । অবশ্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একটা স্ট্যাম্পের উপর আমার স্বাক্ষর নিতে ভুল করলো না, কারণ রোগীকে আমার ইচ্ছায় হাসপাতাল ছাড়তে হচ্ছে ।

ছোট নিশাও বোধহয় বুঝতে পারলো এবং অতিরিক্ত খরচ থেকে অব্যাহতি দেবার জন্য সে ইন্ডিয়া যেতে চাইলো না । ঢাকা থেকে ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে গেলাম । মাঝখানে কলকাতা দুই ঘন্টা যাত্রাবিরতি ছিলো । হাসপাতাল খুঁজে নিতে খুব একটা কষ্ট হলো না । মহীশুরে পড়াশুনা করার সুবাদে লোকাল ভাষাও আমার আয়ত্বে ছিলো । হাসপাতালে ঢুকেই দেখতে পেলাম একটা মন্দির । কাছে গিয়ে দেখলাম একই দেয়াল দিয়ে আলাদা করা একটা গির্জা । অবাক হলাম গির্জার পাশে মসজিদ এবং সাথে শিখদের কোন ধর্মীয় উপাসনালয় দেখে । চতুর্ভুজ এই উপাসনালয়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো একটাই । আনুষ্ঠানিকতা করতে দশ মিনিট লাগল । তিনজন ডাক্তারকে দেখালাম । পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে দেবী শেঠীকে দেখানোর জন্য সিরিয়াল দিলাম । মাঝখানে তিন দিনের অপেক্ষা ।

কিছুক্ষণ জনসেবা করলাম আগত রোগীদের যাদের ভাষাগত সমস্যা আছে । অনেক বাংলাদেশি দেখলাম । স্বভাবতই ভাষাগত সুবিধার কারণে রিসিপশনের ছেলেটার সাথে সম্পর্ক হয়ে গেল । জানতে পারলাম ডাঃ শেঠী যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন নিজের বিমানে করে কোন একজনের অপারেশনের জন্য । আরও জানলাম ঐসব টাকা দিয়ে গরীব রোগীদের জন্য ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় । কৃতজ্ঞতাবোধটা আপনা আপনি চলে এলো । নীড়ের সিরিয়ালটা দুই দিন আগে চলে এলো রাজেশের (রিসিপশনের ছেলে) কল্যাণে । অবশেষে সেই প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হলো.... ।

বিশাল এক কক্ষের মধ্যে দীর্ঘকায় একজন বসে আছেন । কক্ষের একদিকে বাগান যদিও কক্ষটি ৩য় তলায় অবস্থিত । পেছনে দুইটি দরজা সরাসরি অপারেশন থিয়েটারের সাথে সংযুক্ত । জরুরী প্রয়োজনের জন্য ।

'বসুন', ডাক্তারের কথায় বাস্তবে ফিরে এলাম । চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল এই সেই বিশ্বখ্যাত ডাক্তার দেবী শেঠী । টেবিলে রাখা রিপোর্ট থেকে চোখ তুলে ভাঙা বাংলায় বললেন, 'চিন্তার কারণ নেই, নীড় ভালো আছে । ছোট একটা অপারেশন করতে হবে । আমি থাকব অপারেশন থিয়েটারে, উপরওয়ালার উপর ভরসা রাখুন । এটা একটা নরমাল অপারেশন তবে নীড়ের প্রেসার বেশী থাকায় একটু সমস্যা হতে পারে ।' মনে হলো মাথা থেকে পাহাড়ের বোঝাটা কমে গেলো ।

নীড়কে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো । অপারেশন বাবদ এক লাখ রুপি জমা দেয়া (বাংলাদেশি এক লাখ ষাট হাজার টাকা) হলো । এক একটা নার্স যেন সেবার প্রতীক, হাসি মুখে সেবা দিয়ে যাচ্ছে । সময়মত ঔষধ খাওয়ানো ছিল তাদের বড় গুণ ।

একজন নার্স যে কতটা আপন সেটা হাসপাতালে এসে বুঝতে পারলাম। মনে হচ্ছিল আমাদের কোন দরকার নেই। প্রত্যেকটা রোগী যেন তার নিজের ঘরেই আছে।

২৪শে অক্টোবর (নীড়ের বয়স তখন দুই মাস দশদিন) অপারেশনের দিন ঠিক হলো। অপারেশনের পাঁচদিন পর হাসপাতালের বেডে নীড়কে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। তিনদিন হাসপাতালে থাকার পর আমাদের মুক্তি দেওয়া হলো ৬ই নভেম্বর। পুরো সময় জুড়ে আমাকে কোন ঔষধ কিনতে হয়নি বা কোন অতিরিক্ত খরচ দিতে হয়নি।

৬ নভেম্বর সকালে আমাকে এ্যাকাউন্টস থেকে ডাকা হলো। ভাবলাম কোন পেমেন্ট বোধহয় বাকি আছে, কিন্তু কত টাকা অনুমান করা কষ্ট ছিল। 'নীড়ের ফাইলটা ক্লোজ করতে চাচ্ছি, আমার ডিউটা (Due) কি বলা যাবে?' অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উত্তর এলো, 'আপনার তো কোন ডিউ (Due) নেই বরং আমরা আপনাকে কিছু টাকা ফিরিয়ে দিতে চাই। দয়া করে এই ফাইলটা নিয়ে নিচের কাউন্টারে দেখা করলে ওরাই সব ব্যবস্থা করে দিবে।'

চক্ষু কপালে উঠল যখন নিচের কাউন্টার থেকে পঞ্চাশ হাজার রুপি (আশি হাজার টাকা) আমাকে ফিরিয়ে দেয়া হলো। অবাক হয়ে ভাবলাম এটাও কি সম্ভব। অপারেশন, হাসপাতালে ভর্তি, বেড, ঔষধ, প্রায় এক মাস থাকাসহ সম্পূর্ণ খরচ স্কয়ার হসপিটালের এক তৃতীয়াংশ। কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠলো ডাঃ শেঠীর জন্য, পাশাপাশি সেইসব মানুষদের জন্য, যারা আমাকে দেরি না করে ডাঃ শেঠীর হাসপাতালে আসার জন্য বলেছিলেন।

কষ্ট এবং...

কুলসুমা সাথী
সুপারভাইজার, কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড

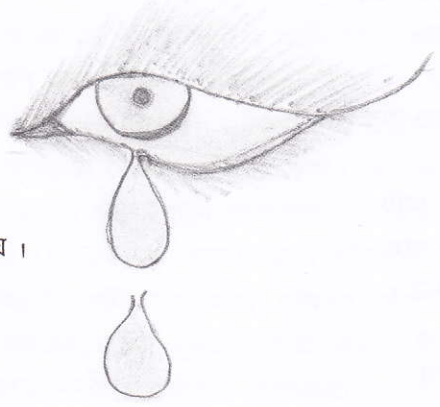

কষ্ট জানো?
জানো আকাশের কষ্ট কি?
তার নীলিমা যখন মেঘের মাঝে হারায়।
জানো চাঁদের কষ্ট কি?
জোৎস্না যখন আঁধারে মিলায়।
জানো শিশিরের কষ্ট কি?
রোদ্রতাপে যখন সে শুকায়।
জানো নদীর কষ্ট কি?
মোহনার আগে যদি গতি হারায়
জানো ফুলের কষ্ট কি?
কুঁড়িতেই যদি সে ঝরে পড়ে যায়।
জানো আমার কষ্ট কি?
শুধু তোমার নীরবতায়।

প্রলাপ

এস এম আরিফ রাজ্জাক
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
ব্যাবিলন ট্রিমস লিমিটেড

তুমি আসবে বলে
আকাশের শরীরে লাল বেনারসি
নিমিষে নক্ষত্র ছিঁড়ে
আকাশের গলায় নক্ষত্রের জড়োয়া।

মেঘের জলকেলী
সেই সুদুর শুন্যে
জল দেবে অকৃপণ
তপ্ত মরুদ্যানে
জল প্লাবনে সাগর দেবে
তুমি আসবে বলে।

সময়হীন কালো গহ্বরে
সময়ের মিথস্ক্রিয়ায়
প্রসব করে সূর্য
সূর্য সকালের প্রথম আলোয়
তোমারই প্রতিক্ষা।

সেই যে কত রাত কত দিন
শব্দ স্নানে সিক্ত
চন্দ্রাহত হেঁটেছি আমি
খোলা জোছনায় পথে
ক্লান্তিহীন কত দিন।

তুমি আসবে বলে
প্রতিক্ষা প্রলম্বিত
ছুঁয়ে যায় গ্যালাক্সীর প্রান্তদেশ।
হৃদপিন্ডে প্রস্তুরীভূত হিমবাহ
সূর্য চুম্বনে গলে যায় জলপ্রপাতে
গলে যায় এ্যালবাট্রসের ওমে
তুমি আসবে বলে।

তুমি আসবে বলে
স্বপ্নেরা যারা–একদা
ছেড়ে গিয়েছিলো অভিমানে
ফিরে আসে শিশিরপাতে
পোড়াটে পৃথিবীর শরীরে
শুষে নেয় শেষ উত্তাপ।

তুমি আসবে বলে
উত্তাল রাজপথ ছেড়ে
মিটিং মিছিল হরতাল ছেড়ে ঘরে
স্বপ্নের সোনালী সুতায় আঁকি।
তোমারই পোট্রেট সাদা নকশিকাঁথায়।

তুমি আসবে বলে
নির্বাসন দেই ইরাকের
লাশ বিদলিত রাজপথের
অথবা নির্বাসন দেই ফিলিস্তিনের বিচূর্ণ আকাশ
নির্বাসন দেই আফগানের বারুদে বাতাস।

তুমি আসবে বলে
হোম যজ্ঞ পৃথিবীর সব অস্ত্রের
অস্ত্রের ভস্ম চিতায়
পরিশ্রুত বাতাস।

তুমি আসবে বলে
আমার চাই ই চাই
এক পৃথিবীর যেখানে
ভালোবাসার গাঢ়তম চুম্বনে
রাঁঢ় ভূমিতে জন্মাবে
শান্তির শুভ্র প্রাণ
তুমি আসবে বলে।

যেতে হবে বহুদূর

আব্দুল কাদির হোসেন (তুহিন)
ফ্যাক্টরী ইনচার্জ
ব্যাবিলন গার্মেন্টস কমপ্লেক্স

দেখতে দেখতে প্রায় ১৮টি বছর পেরিয়ে গেল। যখন আমি গার্মেন্টসে নতুন আসি, এখানকার কাজের সিস্টেম দেখে আমার অনেক ভালো লেগেছিলো। যার যার প্রসেস ভাগ করা। কেউ কোন সমস্যা করলে সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু একটি সমস্যা দেখতাম থেকেই যেতো, তাহলো Uncut Thread. তখন সবাইকে দেখতাম এই ব্যাপারে অনেক ধরনের অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে। আমি তখন ভাবতাম যদি সবাই একটু সচেতন হয়, তাহলে এই সমস্যাটা আর থাকবে না। যেমন একজন কাজ করার সময় যদি দেখে যে, তার আগের প্রসেস থেকে সুতা চলে এসেছে এবং তখন সে যদি অবহেলা না করে নিজেই সুতাটা কেটে দেয় তাহলে এই সমস্যাটা আর সামনে আসবে না। কেউ কোন সমস্যা পেলে নিজেই আন্তরিকভাবে সমাধান করে সামনে দিবে, তাহলে আর কোন অতিরিক্ত সমস্যা থাকবেনা। কিন্তু তখন সবাইকে দেখতাম যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। অন্য কারো সমস্যা দেখার সময় নাই। সবাই এক ধরনের প্রতিযোগিতায় থাকতো- কার চেয়ে কে ভালো কাজ করবে, কিভাবে একটু উৎপাদন বেশি দেখাবে, কাজের গুণগতমান ভাল করবে। সবার মনে একটাই চিন্তা দেখতাম- কাজ আর কাজ। তখন শ্রমিকদের বেতনও তেমন বেশি ছিলোনা।

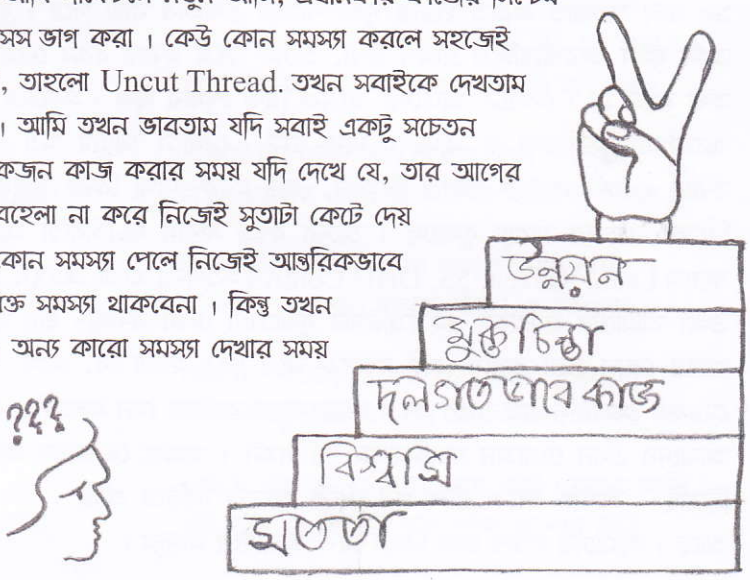

আমার এই চাকুরীর বয়সে শ্রমিকদের কাজের ধারা পরিবর্তন হতে দেখেছি কয়েকভাবে। আমি যখন প্রথম আসি, সেটা ১৯৯৬ সালের কথা। তখন সবাইকে দেখেছি, কিভাবে উৎপাদন বেশি করবে তার অনেক চেষ্টা করতো। তারপরে ২০০০ সাল থেকে প্রায় ২০০৫ সাল পর্যন্ত কোয়ালিটি আরো ভালো করার চেষ্টা করতে দেখেছি। ২০০৫ থেকে এখন পর্যন্ত কমপ্লায়েন্স ঠিক থাকা নিয়ে তাদের চেষ্টা চলছে। কিছু দুষ্ট কুচক্রী লোকের আন্দোলন দেখেছি। বিভিন্ন প্রকার আন্দোলন হয়েছে-যার কিছু ছিল যৌক্তিক এবং কিছু অযৌক্তিক। কারখানা ভাংচুর, আগুন লাগিয়ে দেয়া ইত্যাদি অপতৎপরতা দেখেছি বিভিন্ন সময়ে। ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষকে দেখেছি শ্রমিকদের জন্য পার্টিসিপেইশন কমিটি (PC) গঠন করতে, যাতে শ্রমিকদের সমস্যার কথা মালিকদের কাছে সরাসরি পৌঁছাতে পারে এবং মালিকপক্ষের কথাগুলি শ্রমিকদের কাছে পৌঁছাতে পারে। রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (R&D) সেকশনের ব্যবহার শুরু হয়েছে, যাতে কাজের সঠিক মূল্যায়ন করা যায়। হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সেকশন শ্রমিকদের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কাজ করে। বর্তমানে মালিকেরা, বায়ার, শ্রমিক সবাই কমপ্লায়েন্সের উপর অনেক গুরুত্ব দিচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে তাজরিনের অগ্নিকান্ড এবং রানা প্লাজার মত মর্মান্তিক দুর্ঘটনাও ঘটেছে-যা খুবই বেদনাদায়ক। আমাদের এখানে শ্রমিকদের সুবিধা নিশ্চিতির জন্য পার্টিসিপেইশন কমিটি (PC) অনেক আগে থেকেই কার্যকর রয়েছে।

অনেক সময় সুপারভাইজাররা না বুঝেই বলে-এই কাজটার উৎপাদন আরো বেশি করা সম্ভব, কিন্তু শ্রমিকরা বলে সম্ভব হচ্ছে না। আবার অনেক সময় শ্রমিকেরা না বুঝেই বলে যে এর বেশি করা সম্ভব না। তখন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা না হওয়ার জন্যই R&D Team কাজ করছে, যেন কোন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। কোন্ কাজ কত পিছ করা সম্ভব হবে, R&D Team সেটা আগে থেকেই হিসাব করে রাখে যাতে দুই পক্ষের মধ্যে কাজ নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয় এবং সকলেই যাতে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বুঝতে পারে তার আগাম ধারণা দেয়া হয়। এছাড়াও উন্নত পদ্ধতি যেমন- Lean,

Kaizen, 5S, DHU Control ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে R&D Team উৎপাদন বাড়ানোর সফল চেষ্টা করে যাচ্ছে। এরকম ব্যবস্থাপনা এখন আমাদের দেশে অনেক কারখানায় খুব ভালোভাবে কাজ করছে। এভাবেই আমাদের দেশের পোশাকশিল্প সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কিছুদিন আগে আরো দু'জন সহকর্মীর সাথে বিদেশ ভ্রমণের একটা সুযোগ হয়েছিলো আমার। কোম্পানীর পক্ষ থেকেই এ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো–আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর গার্মেন্টস শিল্প পরিচালনা–প্রযুক্তি বিষয়ে সম্যক ধারণা অর্জন করা। এই উদ্দেশ্যে আমরা শ্রীলংকার দু'টি কারখানা পরিদর্শন করি। একটি কারখানা ভ্রমণ করতে আমাদের ১৯ ঘন্টা যাতায়াত করতে হয়েছে দুর্গম পাহাড়ী এলাকার রাস্তা দিয়ে। যা ছিল খুবই কষ্টকর। তবে এত কষ্ট করার পরেও আমি যখন কারখানাটিতে প্রবেশ করি, তাদের কাজ করার ধরন দেখে আমি এতটাই বিস্মিত হলাম যে, আমার আর কোন কষ্ট রইল না। সেখানে আমাদের অনেক কিছু শেখার ছিল। সবচেয়ে বড় বিস্ময়টি হলো সেখানকার মানুষের কাজের প্রতি অত্যধিক আন্তরিকতা যা আমাদের মধ্যে নেই। সেখানে আমরা অত বেশি স্টাফ দেখলাম না। সবাই যার যার মতো কাজ করছে। কেউ কাউকে পাহারা দিচ্ছেনা, কেউ ফাঁকি দিচ্ছে কিনা দেখার জন্য। সবাই Visual Management এর মাধ্যমে নিজের কাজের অবস্থা বুঝাচ্ছে। তাদের কাজ করার মানসিকতা আমাকে অনেক মুগ্ধ করেছে। আসলে এইভাবে কাজ করলে Lean, Kaizen, 5S, DHU Control ইত্যাদির মতো অসম্ভব কাজকে সম্ভব করা খুবই সহজ হয়ে যায়। তাই আমি এখন আমাদের সবাইকে এই জিনিসটা বুঝানোর চেষ্টা করছি– যার যার কাজ নিজ দায়িত্ব নিয়ে করার জন্য। আমাদের বাসায় যেমন রান্না করার সময় কাউকে বলে দিতে হয়না যে, দেখো লবন ঠিক হয়েছে কি না, ঝাল ঠিক হলো কি না? সেরকম আমাদের এখানকার কাজ করার সময় কাউকে যেন বলতে না হয় দেখেন আপনার কাজ ঠিক হচ্ছে কি না? আসলে আমাদের এখন প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন। আমরা যে ভালো কাজ করতে পারি তার প্রমাণ আমরা আগে অনেকবার দিয়েছি। আমরা কাজে শ্রীলংকার থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। তার মানে আমাদের সামনে ভালো করার অনেক সুযোগ আছে। আমাদের হতাশ হলে চলবে না–যেতে হবে বহুদুর।

তুমি শুধু...

হুমায়ূন কবির
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, এইচআরডি
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

আমি এখন স্বপ্ন দেখি
অথৈই উদার বিশাল নদী
তোমার জন্য ভালোবাসা
বইছে সেথা নিরবধি।

আমি এখন স্বপ্ন দেখি
নীল নীলিমার অসীম আকাশ
থাকলে তুমি আমার পাশে
বইবে সেথা সুখের বাতাস।

হতে পারি জলের মতোন
হতে পারি প্রতিবাদী
যেমনটি চাও হতে পারি
আমার সাথেই থাকো যদি।

ভাগ্যবতী

মোছাঃ পারুল খাতুন
সিনিয়র অপারেটর
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

সত্যি তুই ভাগ্যবতী
লক্ষ্মী সোনা বউ,
স্বামী তোমায় ভালোবাসে
যেন ফুলের মৌ ।

সোনার বাড়ি সোনার ঘর
সোনারী সংসার,
সুখে দুঃখে পাশাপাশি
দু'জন দু'জনার ।

ছোটখাটো দুঃখ ব্যথা
সব ভুলে যাও তুমি,
কাছে এলে সকাল বিকেল
মিষ্টি ভাষন শুনি ।

বট বৃক্ষের ছায়ার তলে
ফুরফুরে বাতাস,
এদিক ওদিক ফিরে ছাড়ো
সুখের নিঃশ্বাস ।

বাংলার ভেনিস

মিরাজুল ইসলাম
অফিসার, প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

নদীর পাড়ের মানু মোরা মোগো বাড়ি বরিশাল
কোম্মে পাইবেন মোগো মতো এত নদী এত খাল
সাগর পাড়ের মানু মোরা মোগো বাড়ি বরিশাল ।

দক্ষিণে চর রাঙ্গাবালী হেইয়ার পাশে পউট্টাখালী
নতুন জেলার নতুন কথা সাগর কন্যা কুয়াকাটা ।

খালে-বিলে পোনার লগে মাছেরও নাই শ্যাষ
বরিশাল যে শাপলা শালুক শীতল পাডির দেশ ।

কোম্মে পাইবেন ভোলার মতো মইষা দুধের দই
আটঘর কুড়িআনার গৈয়া আর সাতলা বিলের কৈ ।

কোম্মে পাইবেন কুমিরের লগে ছোট্ট পোলার আড়ি
এই হানে যে বাংলার বাঘ শেরে বাংলার বাড়ি ।

বাবুগঞ্জের আউকের মিডা উজিরপুরের পান
ঝালকাডির সেরা গামছা বানারি পাড়ার ধান ।

বিএম কলেজ আর অমৃতলাল এর নাইকো কোন জুড়ি
মানুষের মতো মানু মোরা এই মাটিতেই গড়ি ।

রাখাল ছ্যাড়ার বাঁশি না হুইন্যা কাডেনা অলস দুপুর
জারি-সারি আর ভাটিয়ালী মোগো মাঝির সুর ।

কীর্তনখোলা নদী আর দ্বীপরাজ মনপুরা
বরিশাল যে বাংলা মায়ের আলালে দুলালে ভরা ।

লোকসাহিত্য আর সংস্কৃতি মোগো অমূল্য ধন
জীবনানন্দ দাশের কবিতা বিনা ভরে না মোগো মন ।

ঐতিহ্যবাহী চন্দ্রদ্বীপের কীর্তির নাইকো শেষ
মোগো সাধে কি আর হক্কলে কয় বাংলার ভেনিস ।

নদী পথের স্মৃতিকথা

উম্মে সালমা ডালিয়া
ম্যানেজার, প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে পুকুর, নদ-নদী এবং খাল-বিল, আর দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম প্রধান শহর হচ্ছে বরিশাল। আব্বা দীর্ঘদিন বরিশালে চাকুরী করেছেন। আমাদের প্রায় সব ভাইবোনের জন্ম হয়েছে এই শহরে। ঢাকা থেকে বরিশাল যেতে সবচেয়ে সুবিধাজনক মাধ্যম হচ্ছে নৌপথ। আমাদের অনেকেরই হয়তো লঞ্চে চড়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে কিন্তু যারা ঢাকা-বরিশাল রুটে লঞ্চ ভ্রমণ করেননি তারা কোনদিনই বুঝতে পারবেন না লঞ্চ জার্নির আসল মজাটা। এই রুটের লঞ্চগুলো যেমন বিশাল তেমনি বিলাসবহুল। তবে এখানে সব শ্রেণীর যাত্রীদের ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে। যার যেমন সামর্থ্য যাত্রীসেবার মানও তার জন্য তেমন। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়েই বলি। লঞ্চগুলো সাধারণত দুই থেকে তিন তলা বিশিষ্ট। নিচ তলা প্রায় পুরোটাই এবং দুই ও তিন তলার কিছু অংশ থাকে খোলা। নিচে পাটাতন এবং রডের পিলার ছাড়া আর কিছুই থাকেনা। আর এই খালি জায়গাকে ডেক বলে। ঢাকা-বরিশালের লঞ্চগুলো সাধারণত ছাড়ে সন্ধ্যা থেকে রাত ৮-৯টার মধ্যে। বিকেল থেকে যাত্রীরা লঞ্চে আসা শুরু করে। যারা ডেকের যাত্রী তারা সাথে করে নিয়ে আসা চাদর বিছিয়ে তাদের নির্দিষ্ট স্থান ঠিক করে নেয়। এই জায়গাও তাদেরকে লঞ্চের স্টাফদের কাছ থেকে কিনে নিতে হয় একশ দুইশ টাকা দিয়ে। বর্তমানে ডেকের ভাড়া দুইশ থেকে দুইশ পঞ্চাশ টাকা। ডেক ছাড়াও রয়েছে চেয়ার যার ভাড়া ছয়শ থেকে সাতশ টাকা প্রতি রাত। এ ছাড়া রয়েছে সিঙ্গেল কেবিন, ডাবল কেবিন, ভিআইপি কেবিন।

বরিশালে বসবাস করার সুবাদে লঞ্চে রাত্রি যাপনের ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। ডেক থেকে শুরু করে ভিআইপি কেবিনে এমনকি নিচ তলার সাইড বেঞ্চে বসে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আছে আমার। প্রচন্ড শীতের সময় কুয়াশায় চরে লঞ্চ আটকে যাওয়ার আতঙ্কে আতঙ্কিত হওয়া, ঝুম বৃষ্টিতে ঘুমের মধ্যে ভিজে একাকার হওয়া এবং ঝড়ে লঞ্চ এদিক ওদিক কাত হয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হওয়া জাতীয় স্মৃতি এখনও উজ্জল হয়ে রয়েছে আমার স্মৃতিপটে। আবার অনেককে দেখেছি পাশের যাত্রীর কল্যাণে ? সর্বশান্ত হতে। একবার মাঝরাতে ঘুমিয়ে আছি হঠাৎ চিৎকারে ঘুম ভেঙে দেখি এক যাত্রীর সুটকেস নিয়ে পাশের যাত্রীবেশী চোর নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। এরকম বিচিত্র কান্ডকারখানা অহরহ নদী পথে ঘটে থাকে। লঞ্চের ডেকে একসাথে সারারাত কাটানোর ফলে অনেকের সাথে বন্ধুত্বও হয়ে যায়। একবার আমরা দুই বোন আব্বার সাথে ঢাকা থেকে বরিশালে যাচ্ছিলাম। লঞ্চ ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়েছি, কিন্তু খানিকপরে উঠে দেখি আব্বা আমাদের পাশে নেই, একটু দূরে অল্প বয়স্ক ছেলেদের সাথে বসে কার্ড খেলছে। সকালে লঞ্চ ঘাটে ভিড়লে যে যার বাসায় গেলাম। এর অল্প কিছুদিন পর একদিন বিকেলে দেখি লঞ্চে যারা আব্বার সাথে কার্ড খেলেছিলো তারা মিষ্টি নিয়ে আমাদের বাসায় হাজির। ঐদিন লঞ্চে আব্বার সাথে ওদের ভালো একটা সম্পর্ক তৈরী হয়েছিলো। ওরা আমাদের বাসায় এসেছিলো কুশল বিনিময় করতে। ছোটবেলায় যখন ঢাকায় বেড়াতে আসতাম তখন লঞ্চ সদরঘাটে ভেড়ার একটু আগে থেকেই নানা রঙের আলোর ঝলকানি চোখে পড়তো। একটি লেখা আমাকে শিহরিত করতো- 'আমরা বাঙ্গালী, তাই আমরা গর্বিত।' যতবার এই লেখাটা পড়তাম ততবারই মনটা একটা অদ্ভুত ভালোলাগায় ভরে যেতো।

একবার ঈদের সময় ঢাকা থেকে বরিশালে যাচ্ছি। তখন ছিল শীতকাল। রাতের খাবার হিসেবে বাসা থেকে ভুনা খিচুড়ি এবং মাংস ভুনা করে নিয়েছিলাম। রাতে আমরা খাওয়ার পরও বেশ অনেকটা খাবার বেঁচে গিয়েছিলো। যে বয়টা আমাদেরকে প্লেট, গ্লাস ও টেবিল ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো, বেঁচে যাওয়া খাবারগুলি ওকে দিয়ে দিলাম। নিয়মমতো ভোর রাতের দিকেই লঞ্চ ঘাটে ভিড়ার কথা কিন্তু ঘুম ভেঙে দেখি লঞ্চ চরে আটকে আছে। কখন যে আবার লঞ্চ চালু হবে বুঝা যাচ্ছিলোনা। প্রায় চার ঘন্টা পর লঞ্চ চালু হলো কিন্তু তখন বেলা গড়িয়ে সকাল ৮টা। সাধারনত সবাই রাতের খাবার নিয়ে লঞ্চে উঠে। সকালের নাস্তা বাসায় গিয়ে সারা যায়। মুহূর্তের মধ্যে ক্যান্টিনের খাবার শেষ হয়ে গেলো। আমরা না খেয়ে বসে

আছি লঞ্চের বারান্দায় । কিছুক্ষণ পরে দেখি, যে ছেলেটাকে রাতে আমি খিচুড়ি দিয়েছিলাম, সে অন্য এক যাত্রীর কাছে সেই খিচুড়ি বিক্রি করছে চড়া দামে ।

অনেকদিন হলো বরিশালের পাট চুকিয়ে ঢাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করছি । গত বছর ছেলের মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষার জন্য আমার বরিশাল যেতে হয়েছিলো । খুব তড়িঘড়ি করে রেডি হয়ে সদরঘাটের উদ্দেশে রওনা হলাম । সাধারণত ঈদের সময় ছাড়া লঞ্চে কেবিন পেতে তেমন কোন সমস্যা হয়না । এই বিশ্বাসে আগে থেকে কেবিন বুক না করে সরাসরি সদরঘাটে পৌঁছে গেলাম । গিয়েই পড়লাম মহাবিপত্তিতে । কোন কেবিন খালি নেই । টার্মিনালে সাত-আটটি লঞ্চ ছিলো । সবগুলোতেই খোঁজ করলাম কিন্তু কোথাও কেবিন পেলাম না । এদিকে পরের দিন সকালে ছেলের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে । কি যে করব ভেবে পাচ্ছিলাম না । এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে । এমন সময় লঞ্চের একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী তাদের জন্য বরাদ্দকৃত কেবিন অনেক চড়াদামে অফার করলো । কিন্তু সেই কেবিনে থাকার চেয়ে ডেকে বসে যাওয়া অনেক স্বস্তিদায়ক । ঐ কেবিনের ছাদ ছিল খুবই নিচু । কোন রকমে বসে যাওয়া যাবে । এমনকি সেখানে কোন জানালা কিংবা ভেন্টিলেটর ছিলোনা । এরই ফাঁকে আমি ডেকের একটা সিট বুক করলাম দুইশ টাকার বদৌলতে । ছেলে তখনও তার বাবার সাথে কেবিনের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে । রাত ৮টার দিকে আমি লাগেজ নিয়ে ডেকের নির্ধারিত সিটের কাছে গেলাম । মেঝেতে বিছানো চাদরটা এতো নোংরা যে সেটাতে বসতে ইচ্ছে করছিলোনা । কিন্তু জায়গাটা ফাঁকা থাকাতে অন্য যাত্রীরা যথারীতি সেটাকে চেপে সংকুচিত করে ফেলছিলো । এরপর বসে যাবার জায়গাটুকুও থাকবে না এই ভেবে বসে পড়লাম । কিন্তু আমার ছেলেরা কিছুতেই বসতে চাইছিলোনা । ওদেরকে জোর করে বসালাম । এরই মধ্যে অসংখ্য হকার নানা জিনিস বিক্রি করে যাচ্ছিলো । আমরা বসা অবস্থাতেই আমাদেরকে ডিঙিয়ে হকাররা এপাশে ওপাশে যাচ্ছিলো । আমার ছেলেরা অবস্থা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলো । ওরাতো এরকম পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত নয় তাই ওরা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো । এক পর্যায়ে ওরা উঠে চলে গেল ওদের বাবার কাছে কেবিনের চেষ্টায় । আর আমি বসে দেখছিলাম ডেকের যাত্রী এবং হকারদের কার্যকলাপ । এই হকাররা বেশিরভাগই নকল এবং খারাপ মানের জিনিস যাত্রীদের সরলতার সুযোগ নিয়ে বিক্রি করে যাচ্ছিলো । আমি তখন ছোটবেলার স্মৃতি রোমন্থন করছিলাম । ছোট ছেলের ডাকে আমার মোহভঙ্গ হলো । ও বললো, কেবিন পাওয়া গেছে- উপরে চলো । তড়িঘড়ি করে চললাম কেবিনের দিকে আর পেছনে পড়ে রইল অনেক স্মৃতি সম্বলিত ডেক এবং ডেকের যাত্রীরা ।

কৈশোরের কতিপয় কোলাজ-১

মাহমুদ আলম সিদ্দিকি
ডেপুটি ম্যানেজার, এইচআর এন্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

অদ্ভুত সুন্দর দু'টি জলধারা আমাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবহমান। গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে চলা জলধারাটি ছোট্ট কিন্তু মায়াবি। নামটিও ভারি সুন্দর। কুমার। সবাই বলে কুমার নদী। তবে এটি নদী নয়, নদ। বর্ষায় ঘোলাপানির গর্জন তুলতো, আর শীতে শান্ত হয়ে আসা নদীটাতে জোয়ার-ভাটার প্রবাহ থাকতো সারাক্ষণ। শুধু জোয়ার আর ভাটার সন্ধিক্ষণে সামান্য সময় এর জল কিছুটা নিশ্চল হয়ে পড়তো। ঋতু বদলের সাথে সাথে এর নিজের চোহারা আর অববাহিকার পরিবেশ-প্রতিবেশ বদলে যেতো অন্যরকমভাবে। সেই রকমফেরগুলোর ভীষণ রকম স্বাতন্ত্র ছিলো।

অন্য জলধারাটি নিছক একটি খাল ছাড়া আর কিছুই নয়। বৈশাখ মাসের হাঁটুজলের খাল। বর্ষায় একরকম আর শীতে তার পুরো চেহারাটাই যেতো পাল্টে। একটু আগে যে নদীটার কথা বললাম তার পেট ফুটো করে খালটা বেরিয়ে এসেছে। গ্রামটাকে দুইভাগ করে দিয়ে সোজা চলে গেছে পূর্ব দক্ষিণে। আমি বলতাম সুয়েজ খাল। জন্মের কারণ বিশ্লেষণ করলে খাল দু'টির চরিত্রের মাধ্যে এক ধরনের মিল ছিলো। আমাদের একটা ছোট্ট খেলার মাঠ ছিলো খালের পাড়েই। ফুটবল খেলাটাই বেশি হতো। পরে অবশ্য ক্রিকেট এসে সঙ্গী হলো। ফুটবল জমতো বৃষ্টি হলে। তুখোড় জমতো ! ফুটবল না শুয়োরের লড়াই দুর থেকে তা বোঝা যেতো না। পশ্চিম পার্শ্ব রেখার থ্রোইন হতো বল খালে পড়লে। বল কুড়িয়ে আনার অজুহাতে ৬/৭ জন লাফিয়ে পড়ে এক পশলা গা ধুয়ে নিতাম স্রোতের পানিতে। স্কুল খোলা থাকলে খেলার সময়টা পাওয়া যেত খুব অল্প। মাত্র ঘন্টা খানেক। শীতকালে মোটেই না।

খেলার সারথী ছিলো বিভিন্ন বয়সের। ইউনুস, আমার ছোট ভাইয়ের সমবয়সী। আমাদের সাথেও খেলতো। ইউনুসের খেলার একটা আলাদা স্টাইল ছিলো। বেশ রাজকীয়! সংগতির অভাবে ওর পড়াশুনাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রাইমারির গন্ডির ভেতরেই। তারপর ঘর গেরস্থালীর কাজ আর সুযোগ পেলেই খেলায় নিমগ্ন থাকা, বাকিটা ঘুম- এর মধ্যেই ওর জীবন আবর্তিত হতো। ওর খেলার প্রবণতা আমার ছোট ভাইকেও কিছুটা পেয়ে বসলো। সুযোগ পেলেই একটা আড্ডা হয়ে যেতো দু'জনের। বাবা প্রায়ই বকতেন ছোট ভাইকে। পড়াশুনা তোর লাটে উঠবে। সারাক্ষণ খালি খেলাধুলা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কে শোনে কার কথা। দু'টো ছদ্ম নামও নিয়ে ফেললো ওরা। ডাকলে যাতে অন্য কেউ বুঝতে না পারে। যতদুর মনে পড়ে ইউনুসের নাম হলো পাভেল আর ছোট ভাইয়ের নাম হলো খখল। নাম দু'টো একটা উপন্যাস থেকে নেওয়া। গোর্কির মা থেকে সম্ভবত। ঐ বয়সে আমাদের কাছে উপন্যাস জিনিসটা খুব কঠিন ঠেকতো। আমার মা ঐ শক্ত ব্যাপারটাকে আমাদের জন্য গল্প বানিয়ে ফেলতেন। তারপর রাতে শুয়ে শুয়ে সেই গল্প শুনতে শুনতে স্বপ্নের দেশে চলে যেতাম। জোনাকির আলোর ঝাঁকে....।

পরদিন ভোরের আলো ফুটবার পরেই পাভেল ডাক দিতো- ও খ-খ-ল ! খখল সেই ডাক উপেক্ষা করতে পারতো না। আমি ছুটতাম বাজারের দিকে। খালের পাড়ের থেবড়ো, কাঁচা রাস্তাটা ধরে যত দ্রুত সম্ভব সাইকেলের প্যাডেল চালাতাম। সকালের পত্রিকাটা অনেক বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষা করতো জয়নাল চাচার দোকানে। সাইকেলটাকে স্ট্যান্ডের উপরে দাঁড় করিয়ে রেখে খেলার খবরটা পড়ে নিতাম প্রথমেই। বাড়িতে ফিরে বাকি খবরগুলো।

বিকেলে বাজারের মাঠে ক্রিকেট খেলতাম মাঝে মাঝে। খেলা শেষে মাঠের মধ্যে শুয়েই আকাশের দিকে তাকিয়ে বিশ্রাম নিতাম। সন্ধ্যা হয়ে গেলে বাড়ির কাছের ভিটে পার হওয়ার সময় ভীষণ ভয় লাগতো। তাবৎ দুনিয়ার সমস্ত অন্ধকার এসে জড়ো

হতো ভিটেটার গাছ-গাছালীর ঠাসবুননের ভিতর। ভয়ের অনেক উপাখ্যান প্রচলিত ছিল জায়গাটাকে ঘিরে। তারস্বরে একটা উল্টা পাল্টা গান ধরে উল্কাদৌড়ে ভিটেটার সীমানা পেরোতাম। তারপর হাফ ছাড়তাম। কতক্ষণ দ্রুতগতির দম উঠানামা করতো। ঘরে ঢোকার আগে সাবধানে খবর নিতাম বাবা বাড়ি ফিরেছে কিনা? যদি বুঝতাম আসেনি এখনো তাহলে আর পায় কে? আমি তো রাজাধিরাজ। আর যদি উল্টোটা হতে! তাহলে বুঝুন। ভগবাচ্যাকা অবস্থা।

একদিন জৈষ্ঠ্যের বিকেলবেলা ঝড় উঠলো। দুরন্ত কালবৈশাখী। আকাশ কালো হয়ে গেলো। ঝড় থেমে গেলে সেই সন্ধ্যাবেলাতেই পাভেলের (ইউনুস) বেসামাল ডায়রিয়া শুরু হলো। সারারাত শরীরটা পানিশূন্য হতে লাগলো। সকালে চিকিৎসা ক্ষমতার অনেকটাই বাইরে যেতে লাগলো ইউনুসের দেহখানি। রাত শেষে ভোরের আলো ফুটবার আগেই ইউনুস তার চিরচেনা পৃথিবী থেকে বিদায় নিলো। ইউনুসের পরিবারের আকাশচেরা চিৎকার আর বাড়ি এবং পাড়ার মানুষের হঠাৎ হাহাকারে ধনপ্রহরের আলোটাকে নিভিয়ে ফেলেছে। দুরন্ত পাভেলের নিথর, অকেজো দেহটাকে দেখবার সৎসাহস আমার হলোনা। শেষরাতে আরেক পশলা বৃষ্টি হয়েছিলো। একটা পাতলা কাঁথা গায়ে দিয়েছিলাম। সেই কাঁথাটাকে মুখের কাছে জড়ো করে আমি কান্নার শব্দ লুকানোর চেষ্টা করলাম...।

অমর ব্যাবিলন

মোঃ সুরুজ্জামান (মানিক)
ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

কি করব কোথায় যাব
বেড়াই ঘুরে ফিরে,
বেকার হয়ে ঘুরছি আমি
সারা দুনিয়া জুড়ে।

হেথায় ঘুরি হোথায় ঘুরি
তবু যেন হায়!
সারা দুনিয়া ঘুরে আমি
কাজ নাহি পাই।

অবশেষে কাজ পেয়েছি
এক প্রতিষ্ঠানে,
মনে আমার অনেক শান্তি
মা শুধুই জানে।

খুশি মনে করছি কাজ
আমি সারাক্ষণ,
চির অমর হও তুমি
আমার সোনার ব্যাবিলন।

শ্রমিক

মোঃ রবিউল ইসলাম (রবি)
সিনিয়র অপারেটর
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

শ্রমিক মোরা কাজ করে খাই নেই তো কোন লাজ
আলসেমিতে রইনা বসে যদি থাকে কাজ।

উজান পথে হাঁটি মোরা ভাটির দেখা নাই
জীবন যেথায় স্তব্ধ সেথায় মোদের দেখা নাই।

সকাল হলেই কাজের জন্য হই ঘরের বাহির
ঠিক সময়েই কাজের স্থানে সবাই থাকি হাজির।

কাজের মাঝেই শান্তি মোদের, ক্লান্তি করি দুর
কাজ করি আর ভাবি মোরা যাবো বহুদুর।

কষ্টে যারা জীবন কাটায় তাদের ডাকি ভাই
এসো সবাই কাজ করে খাই সুখের অভাব নাই।

দেশ বিদেশে মোদের কাজের আছে অনেক দাম
শত চেষ্টা করেও মোরা রাখবো তার সুনাম।

এমনিভাবে দিন কেটে যায় মাস ফুরালেই বেতন
শত কাজের মাঝেও মোরা থাকি সচেতন।

নিজেকে জানো এবং নিজের মতো করে বাঁচো

আহমেদ তানিম
মার্চেন্ডাইজার
ব্যাবিলন বায়িং সার্ভিসেস লিমিটেড

জীবনে সাফল্য লাভের জন্য আমাদের মনের মধ্যেই একটা বিশাল শক্তি আছে। এর আগে অবশ্যই একটা কথা জেনে রাখা প্রয়োজন, সেটা হল- 'নিজের মনটাকে আগে ভালোভাবে জেনে নাও, তারপর নিজের মত করে জীবন কাটাও। দেখবে, তুমি তোমার মধ্যে লুকিয়ে থাকা শক্তি খুঁজে পাবে।' নিজের ভিতরের সত্তার যখন পরিচয় পাওয়া যাবে তখন যে সময়সীমার মধ্যে নিজের চাহিদা পূরন করার ইচ্ছা তা সহজেই জয় করে নেয়া যাবে। এ জন্য কতগুলো বিশেষ কৌশল আছে, যেগুলো লক্ষ্য পূরন করতে সাহায্য করবে। মনে রাখতে হবে প্রতিটি বিষয়ই কিন্তু আমদের আয়ত্বের মধ্যেই আছে।

জীবনে সফলতা অর্জনকারী লোকেরা জীবন পথের কোন এক সময়ে কিভাবে নিজের জীবন কাটাবে সেই ঠিকানা খুঁজে পায়। যত কম সময়ে শক্তিশালী ক্ষমতার সন্ধান পাওয়া যাবে তত সুখ ও সাফল্যের সাথে জীবন কাটানো যাবে।

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার মনের উপর নিয়ন্ত্রন রাখার যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়েছেন। প্রতিটি মানুষ যাতে নিজের মত ভাবনা-চিন্তা করতে পারে, নিজের মত জীবন কাটাতে পারে, লক্ষ্যপথে অগ্রসর বা লক্ষ্যপূরণ করতে পারে তার জন্য আল্লাহ তায়ালা মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। মানুষ ইচ্ছা করলেই নিজের ভিতরের আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি বা ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ "মানসিক শান্তি" লাভ করতে পারে। কোন মানুষকে প্রকৃত সুখী হতে হলে এই জিনিসটা খুবই জরুরী।

আমরা যে জগতে বাস করি সেখানে বহির্জগতের প্রভাব প্রড়ে থাকে। আমরা সব সময়ই অন্যের কাজ, চিন্তা, রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছি। তবুও এসবের মধ্যে দিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকেরা বলতেন, 'নিজেকে জানো'। এটাই হলো সবদিক দিয়ে সমৃদ্ধশালী হওয়ার মূলমন্ত্র।

সব সময় মনে রাখতে হবে:- জীবনে যা যা প্রয়োজন তার সবই আছে।

ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক। বৈদ্যুতিক আলোর আবিষ্কারক হলেন-টমাস আলভা এডিসন। তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যাকে লেখাপড়া না করার জন্য স্কুল থেকে বহিস্কার করা হয়েছিলো। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার মনোযোগ বা যোগ্যতা তার নেই। অন্যের এই মতামত তার উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এই চিন্তাধারাটি যদি বিশেষ করে তার মনের মধ্যে গেঁথে যেতো তাহলে আজ কি হতো? আজ তিনি কোথায় থাকতেন? বিশ্বের এবং স্বয়ং তার নিজের সৌভাগ্য যে, এডিসন তার নিজের জীবন নিজের খুশি মতোই চলতে দিয়েছিলেন। টমাস আলভা এডিসন খুব অল্প বয়সেই বিজ্ঞানের মাধ্যমে এমন কিছু আবিষ্কার করেছিলেন যা প্রচলিত শিক্ষা ও শিক্ষায়তন থেকে তিনি লাভ করেননি। তিনি যেটা উপলব্ধি করেছিলেন সেটা হলো-তার এমন একটা মন আছে যেটাকে তিনি নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মাধ্যমে তার আকাঙ্খিত বস্তুটি ওই মনের সাহায্যেই লাভ করতে পারেন। স্কুল থেকে সুযোগ না পেলেও নিজেই হাতে কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। সঠিকভাবে সবকিছু শিখে যাওয়ার পর তিনি যখন সবকিছু ঠিকঠাক করতে শুরু করলেন তখন তিনি যে শুধু বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করেন তাই নয়, বিজ্ঞানের জগতে আবিষ্কার করতে লাগলেন একটার পর একটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী জিনিস।

বিখ্যাত শিল্পীরা নিজেদের মত করেই বাঁচেন- তা না হলে তারা বিখ্যাত হতে পারতেন না।

ম্যাডাম গিউমেন হেঙ্ক একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি প্রায়ই একজন সঙ্গীত শিক্ষকের কাছে যেতেন, তার গানের গলা পরীক্ষা করার জন্য। মিনিটখানেক তার গলা পরীক্ষা করার পর সেই সঙ্গীত শিক্ষক তাকে নির্দয়ভাবে বললেন, 'হয়েছে.... থাক। যথেষ্ট হয়েছে! এবার তুমি তোমার সেলাই মেশিনের কাছেই ফিরে যাও। কারণ একটু চেষ্টা

করলেই একজন দক্ষ ও প্রথম শ্রেণীর মহিলা দর্জি হতে পারো কিন্তু গায়িকা হবার যোগ্যতা তোমার নেই।'

এখানে একথা উল্লেখ প্রয়োজন যে, মেয়েটিকে এই কথাগুলো যিনি বলেছেন তিনি একজন সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ। সবাই ভেবেছিলো এরপর সে তার জীবনে গান গাইতে চাইবে না। কিন্তু এত কিছুর পরও মেয়েটি তার মনের মধ্যে গান গাওয়ার স্বপ্নটা সযত্নে লালন করে চলছিলো। সে সব সময় স্বপ্ন দেখতো ভালোভাবে গান রপ্ত করার এবং সে তাই....ই করেছিলো। যদি সে স্বপ্নটাকে যত্ন সহকারে লালন না করতো তাহলে আজ পৃথিবী তার মতো সমৃদ্ধিশালী ও স্ব-কণ্ঠের অধিকারী একজন গায়িকাকে হারিয়ে ফেলতো।

অবশ্য এই হারিয়ে যাওয়ার আরো একটা অন্যতম কারণ আছে। সেটা হলো যে ব্যক্তি এই প্রতিভার অধিকারী সে নিজেই নিজের প্রতিভা সম্পর্কে অবহিত বা সচেতন নয়।

টনিক হিসেব প্রতিকূলতা খুবই কার্যকর? নাকি মানুষকে বোকা বানানোর পদ্ধতি! সব প্রতিকূলতাই একটা বড় টনিক।
যে লোক যত বড়ই সফল হোক না কেন, তাদের জীবনে এক সময় হতাশা, ব্যর্থতা, হতোদ্যম ইত্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো। কারণ এগুলো বাদ দিয়ে জীবনে সফলতা আসতে পারে না। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে। অথচ আমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকেই সেই শক্তি সম্পর্কে সচেতন। কিভাবে এই শক্তিকে বাড়ানো বা জাগ্রত করা যায় সে বিষয়ে অধিকাংশ লোকেরই ধারনা নেই।

একটা কথা যেটা টনিক হিসেবে কাজ করবে তা হলো 'আমি কোন লোকের মতামত বা সমালোচনা গ্রাহ্য করবোনা। আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে, এমন কোন প্রভাব আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেবোনা।' প্রতিদিন দৃঢ়চিত্তে, দৃঢ় সংকল্পের সাথে একথা ভাবার ফলে মন যেমন দৃঢ়তা লাভ করে তেমনই পরবর্তী জীবনে যথেষ্ট তৎপরতার সাথে নানারকম সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

সাফল্য সচেতন মন খুবই দ্রুত এবং ফলপ্রসূভাবে কাজ করে
অনেক সৌভাগ্যশালী মানুষের ইন্টারভিউ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কতো চমৎকারভাবে তাদের মন সাফল্যের দিকে কেন্দ্রিভূত ছিলো। এদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত; কেউ কেউ আবার হেনরি ফোর্ডের মত- যারা স্কুলের শিক্ষাও ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। প্রধানত শিক্ষার অভাব, যথেষ্ট পরিমাণ মেধা না থাকলেও তারা সার্থকভাবে চলবার শক্তিলাভ করেছিলেন। তাদের মনকে সকল বাঁধা-বিঘ্ন দুর করে লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কৃতিত্ব কার? এর উত্তর হলো সেই সব ব্যক্তিদের সাফল্য সচেতনতা। প্রথমে নিজের মনকে জানতে হবে, তার 'সাফল্য সচেতনতা' অর্জন করা যাবে। হেনরি ফোর্ড প্রথমে আয়ত্ব করেন ভালভাবে কিছু করার আর্ট এবং তারপর সাফল্য সচেতন মন দিয়ে আরো এগিয়ে চলেন।

আনন্দে যখন স্বর্গের ঘন্টা বাজে
পরিশেষে বলতে হয় কোন মানুষ যখন নিজের মনকে খুঁজে পায় এবং সাফল্য সচেতনতায় সেই মনকে ভরিয়ে তোলে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করে তখন তার মনে হয় যেন আনন্দে স্বর্গের ঘন্টা বাজছে। ব্যক্তিগত কার্যকলাপের বিজ্ঞানকে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রহণ করেছে। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন-তা অর্থ লাভ হতে পারে, অন্যের ভালো বা উপকার করা হতে পারে অথবা দুটোই হতে পারে।

যেসব মানুষ নিজের মনকে ভালোভাবে জানেন এবং মন যাদের নিয়ন্ত্রনাধীন তাদের মধ্যে কোন কিছুই ক্ষমতার বাইরে নয়।

In Memory of Tazrin's and Rana Plaza's Victims

গুড্ডি

মোঃ জোবায়দুল ইসলাম
অফিসার, মার্কেটিং
ব্যাবিলন ওয়াশিং লিমিটেড

সম্মুখে অথৈ ঢেউ, আছড়ে পড়ছে ঢেউ। বাতাসে ভেসে আসছে সিংহগর্জন। ব্রহ্মার পুত্র-ব্রহ্মপুত্র। এ নদী নয়; নদ। এ নদের সঙ্গে মিলনে বাঁধা তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার-এ তিন নদী।

ব্রহ্মপুত্রের সর্বনাশা থাবায় সময়ের গর্ভে বিলীন হয়েছে চিলমারী বন্দর, কত জনপদ, লোকালয়, শহর, গ্রাম-গঞ্জ, সমাজ, স্কুল-কলেজ, অফিসালয়, মসজিদ, মন্দির-কত ধর্মীয় উপাসনালয়। বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়েছে কত পরিবার, কত প্রিয়জনের চেনামুখ। বংশানুসারে এর গর্ভে বিলীন হয়েছে কত চিরচেনা আপনজনের সমাধিস্থল।

আকাশে কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘ। পাখিরা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। অসহায় মানুষগুলো নিরুত্তর প্রশ্নে দন্ডায়মান। ছুটে চলছে মানুষগুলো। আর কোথায় বা তাদের গন্তব্য।

ছোট্ট উঠানটিতে দাঁড়িয়ে রহমত মিয়া। সম্মুখ ঢেউয়ে আছড়ে পড়ছে জীবনের ছায়া। পিছনে ঘরভাঙ্গা সংসারের দ্রব্যসামগ্রী। পরিবারের সদস্যরা নির্বাক প্রশ্নে দন্ডায়মান। জীবনযুদ্ধে বয়ে চলা- পড়ে থাকা বৈঠাটি হাতে তুলে নেয় রহমত মিয়া।

এই মানুষটাকে কত্ত করি কনুং- 'এইদোন সংসার আর ভালয় না নাগে। ঘর ভাঙ্গা আর ঘর গড়া এইদোন করি আর কতোদিন বাস কইরমো। কষ্ট সইতে সইতে মোর জীবনটা পুড়ি পড়ি তামা তামা হয়া গেইল। ক্যান তোমরা জানেন না, বোঝেন না- আল্লায় মন্নের কষ্ট হামাকে দিছে। হামার মতো মাইনষের জন্য- এইগল্যা যন্ত্রনা ঠিক করি রাইখছে।' স্ত্রী ফজিলার আর্তনাদ আর কান্নার স্বরে প্রতিকূল পরিবেশ আরো ঘোলাটে হয়ে আসে। অদৃষ্টের দিকে তাকিয়ে রহমত মিয়ার চোখ ঘোলাটে অন্ধকার পেরুতে পেরুতে ক্রমশ নদীর অথৈ ঢেউয়ে গিয়ে পড়ে- তার মত শত শত রহমত মিয়ার ছবি, প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

হরি হরি রাম রাম, মা দুর্গা, ভগবান রক্ষা করো রক্ষা করো- জপ করতে করতে ছুটে আসছে এই গ্রামের প্রতিবেশী শ্যামল ঠাকুর। বিপর্যস্ত রহমত মিয়ার পরিবারকে দেখে কিছুটা সময়ের জন্য দাঁড়ায়। 'গ্যালো গো গ্যালো- একে একে মোর সোগ চলি গেইল।' এই শ্যামলদা, এই শ্যামল ঠাকুরের মতো হিন্দু সম্প্রদায়েরা প্রতি বছর ব্রহ্মপুত্রের তেধারা তীর্থে একটি বিশেষ দিনে ('হিন্দুস্টামি') বিগত জীবনের পাপমোচনের জন্য এসে স্নান করে।

পাষন্ড পরশুরাম তার মাকে রাগবশত হাতের কুড়াল দিয়ে মেরে ফেলে। অভিশাপস্বরূপ তার হাত থেকে আর কুড়াল পড়ে না। পাপমোচনের জন্য পরশুরাম বিভিন্ন তীর্থ, মহাতীর্থ ঘুরে ফিরে ঈশ্বর, ভগবান জপ করেও মুক্তি পায়নি। অবশেষে ব্রহ্মপুত্রের এ তেধারায় স্নান সারলে তার হাত থেকে কুড়ালটি পড়ে যায়। এই সেই পুণ্য তীর্থ- অথচ সেই ব্রহ্মপুত্র এই মানুষগুলোর জীবনের দুঃখ কষ্টকে আজো মোচন করতে পারেনি।

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। উন্মুক্ত শীতল বাতাস। স্ত্রী ফজিলার চোখের জল ও টিপ টিপ বৃষ্টি এক হয়ে ঝরে পড়ছে। তাদের সন্তান বৈরী আবহাওয়ায় থরথরে কাঁপছে আর অস্পষ্টস্বরে বাবা-মাকে ডাকছে। এ কণ্ঠস্বর রহমত মিয়ার কাছে বেশ পুরনো, কানে পৌঁছাচ্ছেনা। কেন যে জীবনের বহমান বৈঠায় তার মুখচ্ছবি বারবার জলে ভেসে উঠছে। এখনো তার চোখে উত্তাল তরঙ্গে জীবনের পাল তোলা নৌকা। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে এই নদ, এই নদী। বংশানুক্রমে জীবনের চেনা মানুষগুলো এখানেই জীবন পাড়ি দিয়েছে- স্মৃতিচিহ্ন সমাধিগুলো এর গর্ভেই মিলিয়ে গেছে। শূন্যতার কোন এক মমত্ববোধে কণ্ঠে কেন যে বিমুগ্ধ গান ভাসে- 'নদীর একূল ভাঙে ওকূল গড়ে, এইতো নদীর খেলা।' তীর আঁছড়ে পড়ে তীরে। ছিটকে পড়া জল আলিঙ্গন করে রহমত মিয়ার শরীর, অকুণ্ঠস্বরে বেরিয়ে পড়ে- 'মোর আত্মাটা যেন গোটাল নদীত মিশি আছে।' রহমত মিয়ার সম্মুখ চোখে ফজিলা এগিয়ে আসে। 'তোমরায় কন, এইদোন করি কোন রকমে জীবন চলে, কিন্তু সংসার চলেনা।' রহমত মিয়া জীবনের এ অর্থ জানে। 'জীবনের অর্ধেকটা সময় পার হয়া গেল গো বউ, এই বয়সে মুই এলা কোনটে যাইম, কোনটে যাইমগো বউ।' ফজিলা তার সন্তানের মুখের দিকে চায়। 'আর ছাওয়া পোয়ার ভবিষ্যৎ বলি তো একটা কথা আছে। চলো হামরা উজান দ্যাশত যামো।' রহমত মিয়া ছাড়া আর সকলের কণ্ঠে- 'চলো উজান দ্যাশত যামো।' উজান-উজান-উজান শব্দটি যেন প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। নদীর সিংহগর্জন ক্রমশ তীব্রতর। উঠানের অর্ধাংশ আঁছড়ে পড়ে ঢেউয়ে।

বাবা গো, বাবা। সন্তানের সতর্কতার সংকেতে আকস্মাৎ নিজেকে সামলাতে হাতের বৈঠা ছিটকে পড়ে উচ্ছৃঙ্খল ঢেউয়ে। রহমত মিয়ার চোখ দেখতে পায় স্রোতের ঘূর্ণায়মান পাকে তার বৈঠা ঘুরতে ঘুরতে উঠে দাঁড়িয়ে গেছে। তারপর- তারপর চোখ আর ফিরে তাকায়নি।

রহমত মিয়া তার পরিবার, ভাঙ্গা ঘর সংসারের দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে চলছে- এগিয়ে চলছে। টিপ টিপ ঝড়োবৃষ্টি, রহমত মিয়ার বুকের ভিতর অনুভূত গুমোটবদ্ধ ভ্যাপসা গরম। বৃষ্টি- ঝড়োবৃষ্টি তার চোখে এখন অনেক বৃষ্টি। বৃষ্টির সাথে বৃষ্টি। শিল্পের তুলিতে যার অর্থ কেউ কোনদিন আঁকবেনা। তার বুকটায় এখন কিছুটা হালকাবোধ হচ্ছে।

অসহায় মানুষদের পাশে সাহায্যার্থে বিভিন্ন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবক দল। যাত্রারত রহমত মিয়ার পরিবারের দিকে এগিয়ে আসছে ক'জন। তাদের কাছে পেয়ে তার স্ত্রীর বুকের ভিতরের অব্যক্ত ধ্বনি- 'আর কতোবার নতুন করি ঘর বানামো বাহে, এতো কষ্টের চায়া মরনে ভাল আছিল।' ত্রাণসামগ্রী তাদের দিকে এগিয়ে আসে। কিন্তু অবাক, জীর্ণশীর্ণ এ মানুষগুলোর হাত নীরব, নিস্তব্ধ। সময়ের গভীরতম যে নীরবতা তা ভেঙে নতুন প্রাণের উদ্দামতায় যেন উচ্ছ্বলতা হেসে ওঠে- 'ধুর বাহে, ঐগলা দিয়া কি হইবে?'

চলমান পরিবারের চোখে ফেলে আসা স্মৃতি। জীবনের প্রতিকূলতায় সময় যেন এক স্বপ্নময় ঘুড়ি। সন্তানের চোখে এখন ফেলে আসা নদীতীরে ছোটাছুটি। তারা দেখছে কত সুন্দর বালকেরা ঘুড়ি উড়াচ্ছে। দুর আকাশে ঘুড়িগুলো উড়ছে-উড়ছে। কখনো ঘুড়িগুলো কাঁটাকাটির খেলায় একে অন্যটিকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে। দেখছে-কেটে যাওয়া একটি ঘুড়ি তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ঘুড়ির পিছনে ছুটছে তো ছুটছেই। এই বুঝি ধরা হলো সুতো, এই বুঝি ধরা হলো। ঘুড়ি আরো উপরে ওঠে-আরো উপরে ওঠে।

অবাধ্য মন

রোজিনা আক্তার
সিনিয়র অফিসার, ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড

যে পথে যেতে বারণ
যে পথে গেলেই মরণ
সে পথেই করতে গমন
ছুটে চলে মন।
আমার সাধ্য কি এমন
ঠেকাবো আমার মন।

যে জন নয়তো স্বজন
সে জনকেই ভাবতে আপন
ছুট চলে মন।
আমার সাধ্য কি এমন
ঠেকাবো আমার মন।

যে ঘর নয়তো স্ব-ঘর
সে ঘরেই হতে গৃহী
ছুটে চলে মন
আমার সাধ্য কি এমন।

যে আঁখি রূপেই আঁখি
যাতে নেই কোন জ্যোতির্ময় রাখি
সে আঁখিতেই রাখতে আঁখি
ছুট চলে মন।
আমার সাধ্য কি এমন
ঠেকাবো আমার মন।

জীবন যেখানে যেমন
থাকতে চাওনাতো তেমন
তোমার ব্যাপারটাই যেন কেমন,
হায়রে অবাধ্য মন!

ছড়া

মোঃ মমিনুল ইসলাম (আরিফ)
ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি এ্যাস্যুরেন্স
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

ঢাকা শুধু ঢেকে থাকে খুলনা যায় খুলে
পাবনা গেলে ভাবনা হয় পথ যাবো ভুলে।
বরিশালে শাল নেই আছে সুপারি
বগুড়ার খাসা দই খেতে মজা ভারী।

রংপুরে নানা রঙের তামাক পাতা পাই
ঘুরে ফিরে চাল আনতে দিনাজপুরে যাই।
রাজশাহীতে রাজা নেই আছে শুধু আম
ময়মনসিংহে সিং নেই সিং তবু নাম।

চট্টগ্রাম গাঁ নয় বড় সে নগর
বন জঙ্গলে পাহাড় দেশে দিচ্ছে মনোহর।
কুমিল্লাতে তাঁতের কাপড় তাঁত বাড়ি বাড়ি
সিলেটেতে চায়ের বাগান টাঙ্গাইলের শাড়ি।

নাটোরের কাচা গোল্লার অতি সমাদর
বড় বড় কৈ খেতে যাও যশোহর।
ফরিদপুর নয় দুরে ঢাকার সাথে লাগা
কুষ্টিয়াতে শিয়ান, পন্ডিত, কবিগুরুর জা'গা।

৬৫ জেলা, ৮ বিভাগ মানুষ ১৮ কোটি
এই নিয়ে আমাদের বাংলাদেশের মাটি।

আমি ও আমার ভালোবাসা

সুলতানা খাতুন
পলিম্যান, ফিনিশিং
সুরভী গার্মেন্টস লিমিটেড

পৃথিবীর অন্য সবার মতই আমি একজন রক্তেমাংসে গড়া মানুষ। আমিও আর সবার মত স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হই। আমার স্বপ্নগুলো জুড়ে রয়েছে আমি, আমার প্রিয় গ্রাম, আমার দেশ, এই পৃথিবীর মানুষ তার সাথে আমার প্রিয় ব্যাবিলন। এই পৃথিবীতে আমার আবেগ-অনুভূতি, ভালোলাগা ও ভালোবাসা, আমি যা কিছুকে মূল্য দেই- এগুলোর প্রত্যেকটি আমার এক একটি অঙ্গ। এ অঙ্গগুলো ছাড়া আমার বেঁচে থাকা অর্থহীন। আমার ভালোবাসার ছোট্ট গ্রাম, এই দেশ আর এই পৃথিবীকে এবং আমার প্রিয় ব্যাবিলনের অষ্টম সংখ্যার কথকতাকে আমার স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাই। আমার উপলব্ধিতে এ পৃথিবীতে আমার কাছে গুরুত্ব রাখে যে জিনিসটি তা হলো ভালোবাসা। আমার অধিকার আছে, আমি যা করতে ভালোবাসি তা করবো। আমি মানুষদের নিয়ে অনেক ভাবতে চাই, তাদের জন্য কিছু করতে চাই-যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব। আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করি। কারণ আমি একটি ব্যাবিলন পরিবার পেয়েছি। কথকতার সদস্যদের মাঝে লেখিকা হিসেবে স্থান পেয়েছি। আমার সকল সদস্যের দোয়া ও ভালোবাসা পেয়েছি। আমি নিজেকে নিয়ে অনেক গর্ববোধ করতে পারি। আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি এই পৃথিবীর বাবা-মা হারিয়ে যাওয়া এতিম অসহায় সন্তানদেরকে- যাদের জীবনে নেমে আসে অন্ধকার, ভবিষ্যৎ হয়ে পড়ে অনিশ্চিত। সবাই এ অন্ধকার কাটিয়ে আলোর সন্ধান পায় না। একটু ভালোবাসা নিয়ে কিছু মানুষ এগিয়ে আসলেই তাদের ভবিষ্যৎ হতে পারে সম্ভাবনাময়। একটু ভালোবাসা পেলেই বদলে যেতে পারে তাদের জীবন। বাড়িয়ে দিতে পারে তাদের মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাকে। আমি মনে করি, নিজের সন্তানকে নিজের দায়িত্বে পালন করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়না। জীবনকে একটু সুন্দর করার তাগিদে আমরা প্রতিটি মানুষ সবাই সবার প্রতি সাধ্যমতো এগিয়ে আসবো। আমরা যাদের দেখতে পাই তাদের যদি ভালোবাসতে না পারি, তাহলে যে আল্লাহকে আমরা দেখতে পাই না, তাকে কেমন করে ভালোবাসবো ? তাই আমি অসহায় মানুষের কাছে থাকতে চাই। আমি কিছু না করতে পারলেও আমার ভালোবাসা দিয়ে তাদের জীবন ভরিয়ে দিতে চাই। আমি যেখানে যে পর্যায়েই থাকিনা কেন, সবার প্রতি থাকবে আমার দোয়া ও ভালোবাসা। আমি খুব বড় ঘরের মেয়ে নই। আমি নিজেকে খুশি রাখতে মানুষকে ভালোবাসি। আমি আমার কর্মজীবনকে, আমার কাজকে অনেক বেশি ভালোবাসি। কারণ ভালোবাসা না থাকলে কোন কাজেই সাফল্য অর্জন করা যায় না। আমি এমন কোন কিছুই করবো না যাতে আমার ভালোবাসার অসম্মান হয়। মনুষ্যত্বের অসম্মান হয়। যে কোন মানুষের কষ্ট আমাকে কাঁদায়। আমি চাই আমার ভালোবাসার মানুষরা যেন আমার চোখে আমার অন্তরের ভালোবাসাটুকুর প্রতিফলন দেখতে পায়।

কে আমাকে ভালোবাসলো কে ভালোবাসলোনা এসব নিয়ে অযথা ভাবতে আমার ভালো লাগেনা। আমি কবিতা, গল্প লিখতে ও পড়তে ভালোবাসি, আমার ভাবনাগুলোকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে ভালোবাসি। আমি গাছ লাগাতে ভালোবাসি, পাখির কিচিরমিচির শুনতে ভালোবাসি। তার সাথে আমার মাকে খুব বেশি ভালোবাসি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমার মা আমাদের চার ভাইবোনের জীবন থেকে ১৯৯৮ সালে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গিয়েছেন। আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হলো আমার মা। যার ভালোবাসার ঋণ কোনদিন শোধ করা যাবেনা। তিনি এমন স্বার্থপরভাবে এই অদ্ভুত পৃথিবীতে আমাদের ভাইবোনদেরকে প্রতিষ্ঠা করে আমাদেরকে একা ফেলে এখন পরম নিশ্চিন্তে মাটির বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন। আমার মায়ের ভালোবাসা কোনদিন ভুলবোনা। আমার মা'র ভালোবাসা সারাজীবন বুকে ধরে রাখবো। আমি এখন স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি-যা কেউ কখনো দেখেনি। আমি এমন চিন্তা করতে ভালোবাসি- যা কেউ কোনদিন করেনি। আমি এতটাই ভালোবাসতে পারি যা কেউ কখনও বাসেনি কিংবা বাসতে পারবে না। আমার মতে মানুষ যে স্বপ্নই দেখুক না কেন, যে কাজই করুক না কেন, ভালোবেসে করলে সে সফল হবেই। আমি কতটুকু লিখতে পারবো জানি না। তবু আমি লেখার চেষ্টা করবো। আমার স্যারদের দোয়া ও ভালোবাসা পেলেই আমার জীবনের গল্প লেখার উদ্দেশ্য পূরণ হবে। আমি যা লিখছি বা লিখব তা নিয়ে আমার কর্মজীবনের মাঝে আমি একটা গর্ববোধ করতে পারি যে, আমি কম কথার মাঝে কিছু গল্প কবিতা লিখতে পেরেছি। পৃথিবীর সকল অনুভূতির উর্দ্ধে ভালোবাসা। একে ধরা যায় না, এটা শুধুমাত্র অনুভবের ব্যাপার। জীবনধারায় আমি অনেক বেশি যুক্তিবাদী হতে চাই না। খোদার কাছে প্রার্থনা করি, আমার ভালোবাসা যেন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি, সবচেয়ে বড় গৌরবের হয়ে থাকে। আজকের আমার মতই আমি যেন সারাজীবন মানুষের জন্য কাঁদতে পারি। আমার ভালোবাসার জোরেই পৃথিবী থাকুক আমার কাছে পবিত্র ও সুন্দর হয়ে।

হারায়ে খুঁজেছি যারে

জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা
ওয়েলফেয়ার অফিসার
সুরভী গার্মেন্টস লিমিটেড

তোমায় নিয়ে হারিয়েছি কোন এক কবিতাতে
কখনো নীলিমার নীলে,
কখনো রঙধনুর সাতটি রঙে ।
একি! হঠাৎ একফালী মেঘ এসে ঢেকে দিল
আমার কল্পনার রঙগুলোকে ।

তোমায় নিয়ে হারিয়েছি কোন এক বিকেলে
আনমনে পথের ক্লান্তিহীনতার মাঝে ।
তোমায় বুঝতে চেয়েছি অজানাতে
তুমি কি দুর আকাশের নীহারিকা–
নাকি সেঁজুতি মরীচিকা?

তোমায় নিয়ে ভেবেছি কোন এক বৈরী হাওয়ায়
ঝুম বরষার নিস্তব্ধতার মাঝে
ভালোবাসার চাদর বিছানো সাগর পাড়ে ।

তুমি কি শেষ বিকেলের অস্তমিত
রক্তিম রাঙা টিপ–
নাকি বালুচরে ভেসে আসা
সমুদ্রের সিক্ত ঢেউ?

তোমায় নিয়ে ভেবেছি নীরবে নিভৃতে
রোদেলা দুপুরের মরু প্রান্তে
দুর আকাশের তারার দেশে
ফাগুনের অগ্নিশিখাতে ।

তুমি কি বৈশাখী ঝড়ো হাওয়া–
নাকি চমকিত বিজলীবাতি?
একি! এযে দেখি সমুদ্রপাড়ে
উড়ে যাওয়া গাঙচিলের
স্মৃতিময় রক্তক্ষরণ ।

কাজ

মোঃ মামুন হোসেন
ড্রাইভার
ব্যাবিলন ট্রিমস লিমিটেড

টিক্ টিক্ টিক্ ঘড়ির কাটা ঘুম থেকে যাই উঠি
নাওয়া খাওয়া সেরেই তবে অফিস পানে ছুটি ।
আটটা বাজার আগেই মোরা অফিসে যাই চলে
দেরি হলেই অনেক স্যারে অনেক কথা বলে ।
মনের ভিতর কোন কষ্ট পুষে নাহি রাখি
কাজের সময় কাজ করি মোরা দেইনা কভু ফাঁকি ।
অনিয়মের ধার ধারিনা সঠিক পথে চলি
শত কষ্টের মাঝে মোরা সত্য কথা বলি ।
মিলে মিশে থাকি সবাই ফ্যাসাদ নাহি করি
হালকা পাতলা কাজ যে মোদের নয় কোন কাজ ভারি ।
ব্যাবিলনের নিয়ম–নীতি আমরা সবাই মানি
মনের কষ্ট ঘুচলো মোদের মুছলো চোখের পানি ।
মনের ভিতর আছে মোদের অনেক অনেক আশা
পূর্ণ হবেই ব্যাবিলনের প্রতি থাকলে ভালোবাসা ।

ছিনতাই

মৌমিতা
সিনিয়র অপারেটর
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড

পথের উপর লোকটা খাড়া
দেখতে অতি ভয়ঙ্কর,
কাছির মতো গোঁফ পাকানো
মূর্তিমাণ এক আতঙ্ক ।
বুকে আমার ধরলে ছুরি
চোখ বুঁজে যায় ভয়ে,
লোকটা বলে কই পালাবি
যা আছে তা না দিয়ে?
দিয়ে যা সব ঝেড়ে
নয়তো প্রাণটাই নেব কেড়ে ।
পয়সা–কড়ি ঘড়ি জুতো
দিতে হলো অতি দ্রুত ।
তারপরেও বলল সে যে
দেরে এবার প্যান্টটাও দে ।
তখন আমি কি আর করি
প্যান্টটা দিয়েই বাড়ি ফিরি ।

দর্জি বিজ্ঞান ঃ এসো নিজে করি

আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ
ম্যানেজার, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

যারা আমার লেখালেখির সাথে অল্পবিস্তর পরিচিত তাদের একটাই অভিযোগ যে আমি আবেগী লেখক। আমার কিছু লেখক বন্ধুর ধারণা, আমি যদি পদার্থবিদ্যার কোন নোট বইও লেখি সেখানেও থাকবে আবেগের ছড়াছড়ি। এবার ব্যাবিলন কথকতার জন্য লেখা দিতে যেয়ে ঠিক সেরকম একটা আবেগী লেখাই বেছে নিয়েছিলাম। লেখাটা গার্মেন্টস জগত থেকে অনেক দুরের। আমার ফেলে আসা শহর ও আমাকে নিয়ে। মাহমুদ ভাইয়ের হাতে সেই লেখা তুলে দিতে চেয়েছিলাম। সময়ের দাবিতে বিষয়টা পাল্টালাম। তবে বিষয়টা যতই ব্যবসায়ীক হোক না কেন, এখানে আবেগটাকে ফেলে দেয়াটা হবে বোকামীর নামান্তর। আর এখনই বলে নিচ্ছি, আমার এই লেখাটা কমনসেন্স দিয়ে পড়তে হবে, চুলচেরা বিশ্লেষণ দরকার হলে নিজের মাথা খাটাবেন। আপনার হয়ে অন্য কেউ মাথা খাটিয়ে দেবে সে সময় আর নেই বন্ধু।

দেখুন, গার্মেন্টস শিল্পটার ইতিহাস আমরা যারা অল্প বিস্তর জানি, তারা জানি যে এই ব্যবসাটা 'শিল্প' হিসেবে শুরু হয়নি, শুরুটা ছিলো নেহাতই এক কয়েন টস। যারা আমার এই কথার দ্বিমত করবেন তারা ভেবে দেখুন ১৯৮০ থেকে ১৯৮৮, এই ৮ বছরে কত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো আর কতটা বন্ধ হয়েছিলো। সেখানে কতটা ছিলো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা আর কতটা ছিলো ওয়ানটাইম বিজনেস? যাহোক, এটা আমার আলোচনার বিষয় নয়।

সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে অনেকেই দুর্ঘটনা বলে পাশ কাটালেও আমি সেগুলোকে আক্কেলসেলামি বলেই আখ্যায়িত করতে চাই। জাতি হিসেবেই আমরা দুরদর্শী নই। আর সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো অদুরদর্শিতার ফল। পুরোনো কাসুন্দি না ঘেটে আসুন আমরা কি করতে পারি সেটা দেখা যাক।

সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়বে কার উপর মালিক না শ্রমিক, এই তর্ক বাদ দেবো আমি, কারণ কে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মালিক না শ্রমিক– এটা এখন মূল্যহীন তর্ক। আমার কথা হচ্ছে, প্রভাব পড়বে শিল্পটার উপরে। আমি এখানে মালিক ও শ্রমিক দুই পক্ষকেই সরিয়ে রাখছি। আর শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হলে প্রভাব পড়বে মালিক ও শ্রমিক উভয়ের উপর।

শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি, সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ও কমপ্লায়েন্স খাতে খরচ বৃদ্ধিটা মোকাবেলা করতে হবে আমাদেরকেই। ঐ দুই খাতে খরচ হবে মেনে নিয়েই আমাদেরকে আগাতে হবে।

মার্চেন্ডাইজিং বিভাগঃ আমরা জানি সবচেয়ে আগে চাপে পড়বেন আপনারা। বায়ারের সাথে মূল্য নির্ধারণের যুদ্ধ আপনাদেরকেই করতে হবে। কিন্তু আপনাদের ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভালোমানের কাঁচামাল, সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে সঠিক স্থানে পৌঁছানোটাই এই সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যাকে JIT (Just In Time) বলা হচ্ছে। আমি আবারো বলছি, ভালোমানের কাঁচামাল। কিছু কিছু বায়ারের ফেব্রিক এত খারাপ মানের আসে যে উৎপাদনের খরচ ওখানেই মুখ থুবড়ে থাকে। শেডিং, রিজেক্ট ও ডিফেক্ট রিপেয়ার শেষে লাইনের ইফিসিয়েন্সি শতকরা ৩০–৩৫ এ আটকে থাকে। একটা সহজ হিসাব হচ্ছে, একটা প্রোডাক্টের টোটালের ৬২%–৬৫% হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল কস্ট। এখানে কিন্তু আপনাদেরই ভূমিকা। আমরা মার্চেন্ডাইজিং বিভাগকে ডেস্ক ডিপার্টমেন্ট করে রেখেছি। হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া পুরো সাপ্লাই চেইনে আমাদের বিচরণ কম। মার্চেন্ডাইজিং থেকে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট করতে হলে পুরো সাপ্লাই চেইন বোঝাটা জরুরী বলেই আমি মনে করি। কমিউনিকেশন গ্যাপ কমানোর জন্য মার্চেন্ডাইজিং ও কো–অর্ডিনেশন এই দুইকে এক করার কোন বিকল্প নেই।

প্লানিং বিভাগঃ প্রোডাক্ট ফ্যামেলী অনুযায়ী লাইন সিলেক্ট করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। জানি যে শিডিউল ঠিক রাখতে আপনারা হিমশিম খান। কিন্তু এই অগোছালো অবস্থাটা গুছিয়ে নেয়াটা জরুরী। সব ধরনের কাঁচামাল না এলে লাইনে ইনপুট দেয়াটা

হবে আগামী দিনগুলোর জন্য বড় ভুল । কোন লাইন একদিন বসে থাকলে আমরা চিন্তায় পড়ে যাই, যেভাবে হোক লাইনটা চালাতে চাই, কিন্তু এভাবে লাইনের কাজ জমা করিয়ে পরে ওভারটাইমে জমা কাজ চালালে খরচ কোথায় যায় এবার ভাবতে হবে । তাছাড়া কোন কাজ যদি লেবেল বা বোতাম এই সবের জন্য জমা করে রাখা হয়, সেখানে ড্যাম্পিং ইফেক্ট হয় । ডিফেক্টের পরিমাণ বাড়তে থাকে । সেটার খরচ নেহাত মন্দ নয় ।

দরকার হলে একটা লাইন একদিন-দুইদিন গ্যাপ থাকুক না । গ্যাপ ঠেকাতে একটা প্রোডাক্ট লাইনে জমা রেখে অন্য প্রোডাক্ট চালিয়ে দেয়াটা ম্যানেজমেন্ট নয়, ওটা মিসম্যানেজমেন্ট ।

প্লানিং থেকে কাঁচামাল সঠিক সময়ে ইনহাউজ হওয়ার একটা স্বাভাবিক তাড়া থাকতে হবে মার্চেন্ডাইজিংয়ের উপর । আমরা দেখছি যে, মার্চেন্ডাইজিং অনুসারে প্লানিং বিভাগ চলছে । কিন্তু এটা ভুল । প্লানিং অনুসারে মার্চেন্ডাইজিং চলতে হবে । সবকিছু হতে হবে প্লানিং অনুসারে । জানি এখানে এসে অনেকেই ভ্রু কুঁচকে আছেন, হা হা হা.... এখানে কমনসেন্সের পাশাপাশি মাথাটাও খাটাতে হবে বন্ধু ।

স্টোর বিভাগঃ প্লান অনুযায়ী সঠিক মালামাল দেয়াটা খুব জরুরী । আমাদের অভ্যাস হচ্ছে একবারে বেশি বেশি মালামাল সুইং বিভাগে দিয়ে দেয়া । এতে করে অপচয় হয় বেশি । বোতাম, সুতা কিংবা লেবেল জাতীয় মালামাল দিনের টার্গেট অনুসারে দেয়াটা জরুরী। এতে অপচয় হবে কম । দিনের শেষেই বোঝা যাবে যে মালামাল অপচয় হচ্ছে কিনা । আর নয়তো অর্ডারের শেষের দিকে এসে ধরা পড়বে এবং তখন তা যোগান দেয়াটা মার্চেন্ডাইজারের জন্য দুরূহ । (একবার ভেবে দেখুন তো, আপনি আপনার সন্তানের হাতে একবারে বছরের যাবতীয় হাত খরচ দিয়ে দেন কিংবা আপনার বাবা কি আপনাকে দিতেন? আমার বাবা তো দিতেন না । তখন রাগ হতো, এখন বুঝি । আর বুঝি বলেই আমার ছোট বোনকে একমাসের হাত খরচ একবারে দেইনা.... হা হা হা)

যা হোক, খোঁজ নিলে দেখা যাবে অনেক শর্ট শিপমেন্টের কারণ এই ধরনের অপচয় । আগেই বলেছি যে একটা প্রোডাক্টের টোটাল কস্ট এর ৬২%-৬৫% হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল কস্ট, এখানে যে অপচয় হয় তা রোধ করার ভূমিকা কিন্তু আপনাদেরই হাতে।

কাটিং বিভাগঃ কাটিং বিভাগের মূল ভূমিকার বিষয়টি মজার । এখানে একজন একসাথে একই সময়ে ১৫০ পিছ পার্টস্ বা এর কম বেশি সংখ্যক পার্টস্ কাটেন । এখন তিনি যদি একটু এদিক ওদিক করেন তাহলেই তত সংখ্যক বার সমস্যা হবে সুইংয়ে । ব্যাপারটার ভয়াবহতা একটু অনুভব করার অনুরোধ জানাচ্ছি । এখানে একটা নাম্বারিং মিসটেক সুইংয়ে কি প্রভাব ফেলবে ভেবে দেখুন । এখানে যদি ৫ মিনিট বেশিও লাগে লাগুক, সময় নিয়ে কাজ করুন । তাড়াহড়া বা শর্টকাট চিন্তা বাদ দিন । পরিশ্রম বেশি হোক, পরিশ্রম বাঁচাতে গিয়ে চেক মেলানোর ক্ষেত্রে একটুও ছাড় দেয়া হবে মারাত্মক ভুল । এখানে ব্লক কাটিংয়ে কিংবা ব্যান্ড নাইফে একজন একটু অসতর্ক হলে সুইংয়ে ঝামেলায় পড়বে কমপক্ষে ১৫ জন বা তারও বেশি । রিজেক্ট রিপ্লেসে অবহেলা করলে ওখানে সেটা মেলাতে সময় নেবে ১০ গুণের বেশি সময় ।

কাটিং বিভাগের উচিত ক্যাড ও সুইংয়ের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা । যোগাযোগ যত সহজ ও সাবলীল হবে ভুলের পরিমাণ ততই কমবে ।

সুইং বিভাগঃ সুইংয়ের উপর পড়বে সবচেয়ে বেশি চাপ, তাদের ভূমিকা কতটুকু তা আলোচনায় আসুক বা না আসুক । এখন দেখি আমাদের করণীয় কি কি....

আমি প্রথমেই বলবো যে কাটিং স্যাম্পলগুলোকে আপনারা গুরুত্ব দিন । টেস্ট কাটিং স্যাম্পল যেন প্রথমবারেই মানসম্মত হয় এবং খুব দ্রুত হয় । আমরা মনে করি যে, টেস্ট কাটিং লাইনের প্রোডাকশনে ক্ষতি করে । হ্যা কিছুটা তো করেই, কিন্তু সেটাতো হবেই । কিন্তু যদি আমরা সেটা দিতে দেরি করি তবে ক্ষতিটা শুধু বর্তমান প্রোডাকশন ছাড়িয়ে ভবিষ্যৎ প্রোডাকশন পর্যন্ত গড়ায় । টেস্ট কাটিং দিতে আপনি একদিন দেরি করলে ঐ প্রোডাক্ট আপনার লাইনে নির্দিষ্ট সময়ের একদিন পরে আসবে । আপনি সুইংয়ে সময় কম পাবেন । আর তাই টেস্ট কাটিং স্যাম্পল যথাসম্ভব দ্রুত দিয়ে প্লানিং ঠিক রাখাটা আপনার

জন্যই জরুরী।

এবার আসুন একটা হিসাব করি- আমরা যে সুতাটা কাটার জন্য হেলপার দেই, এই কাজ আসলে কত সময়ের। এই ধরুন একটা গার্মেন্টসের সাইড সিম করতে প্রায় ৪০ সেকেন্ড লাগে। কিন্তু তার সুতা কাটতে লাগে ১০ সেকেন্ড। কিন্তু হেলপার এই কাজ এত ধীরে করে যে তার সামনে কাজ জমা থাকে। কেউ কেউ দুইজন হেলপারও দেন। এখন দেখুন হেলপারের কাজ কিন্তু ঐ ১০ সেকেন্ডের, বাকি ৩০ সেকেন্ড সে অপচয় করে। এমন আরো প্রসেস দেখবেন যে হেলপার আসলে অপারেটরের তুলনায় অর্ধেক বা তার বেশি সময় অপচয় করে। এখন অনেকেই মনে করেন যে সুতা কাটার কাজ অপারেটর দিয়ে করালে খরচ বেশি পড়বে। আমার কথা হচ্ছে একটা হেলপারেরর তুলনায় অপারেটরের বেতন কিন্তু দ্বিগুণ নয়। সেটা বড় কথা নয়, কথা হলো অপচয় হচ্ছে। যে সময়ের জন্য বেতন দেয়া হচ্ছে, সেটার কোন ফল আপনি পাচ্ছেন না। আপনি একটা পরীক্ষা করে দেখুন, অপারেটরকেই বলুন সুতা কেটে কাজ করতে। ঐ অপারেটর সর্বোচ্চ এক সপ্তাহের ভেতর ৮০% ইফিসিয়েন্সিতে কাজ করবে। আমি লাইন ব্যালেন্স করতে একটা প্রসেসে একটা অপারেটর বাড়াতে রাজি, তাতে যদি ১০% থেকে ১৫% পর্যন্ত ক্যাপাসিটি বেশিও হয়, কিন্তু দুইটা হেলপার দিতে রাজি নই।

লাইনকে ছোট করতে হবে, একজনকে ছোট ছোট একাধিক কাজ দিয়ে লাইনে লোক কমাতে হবে। কারণ বেশি লোক মানেই অপচয়ের বেশি সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি হচ্ছে- এক লাইনে অপারেটরের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া। মেশিন নয় অপারেটর। ধরুন ৪০ জন। এখন যে কাজ আসবে তার এসএমভি অনুসারে ঐ কাজ ৪০ জনের মাঝে ভাগ করে দেয়া হবে। প্রতি ৪০ জনে ৩ জন কোটার অপারেটর থাকবে এ্যাবসেন্টিজম ব্যাকআপ হিসেবে। এরা সরাসরি লাইন লে-আউটে থাকবে না। তবে লাইনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এক্ষেত্রে টার্গেট কম বেশি হবে। ঠিক বর্তমান সময়ের উল্টা, এখন টার্গেট ঠিক থাকে, লাইনে অপারেটর কমবেশি হয়।

প্রসেস অপারেটরের ধারণা ছাড়তে হবে, মেশিন অপারেটরের ধারণা মাথায় ঢুকাতে হবে। যে অপারেটর ওভারলক পারবে সে ওভারলকের যেকোন কাজ করার প্র্যাকটিস করবে। এই মানসিকতা খুব জরুরী।

মার্ক ছাড়া কাজের পদ্ধতি বের করতে হবে। প্যাটার্ন ধরে, মেশিন টেবিলে মার্ক বা গেজ বসিয়ে, জিগ প্যাটার্ন ব্যবহার করে কাজের অভ্যাস থাকতে হবে।

লাইন টার্গেট অনুসারে ব্যালেন্স করতে হবে। আমরা প্রায় দেখি কোন অপারেটর তার প্রসেসে ১৫০ পিছ কাজ করে কিন্তু লাইন টার্গেট ১০০ পিছ। এই ক্ষেত্রে ঐ ৫০ পিছ কাজের সময়কে ব্যালেন্স করতে হবে। লাইনে ক্যাপাসিটি গ্যাপ ১৫% এর উপরে যেতে দেয়াটা চরম ভুল। এতে লাইনে WIP (Work In Process) বাড়ে। আর এটার কুফল আমরা আমাদের ট্রেনিংগুলোতে শিখেছি ও লাইনেও দেখেছি।

পুরোনো একটা কথা বলি, স্টাইল চেঞ্জওভার গাইডলাইন যেটা দেয়া আছে, সেটা অক্ষরে অক্ষরে মানার সময় হয়ে এসেছে। 'ওস্তাদের মাইর শেষ রাইতে'- এই প্রবাদে যারা বিশ্বাস করেন, তাদেরকে বলছি, ঐ দিন আর নাই। সঠিকভাবে প্লান করে কাজ না করলে লাভের মুখ দেখা যাবে না আর।

কোয়ালিটি বিভাগঃ বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়টা শ্রমিকের মজুরী। হ্যা। বিশ্বে সবচেয়ে কম মজুরীর শ্রমিক এদেশে। কিন্তু কাজের মান বিচার করলে আমরাই কি বিশ্বের সবচেয়ে ভালো মানের শ্রমিক? কক্ষনোই না। কেউ কেউ হয়তো তর্ক জুঁড়ে দিবেন। তারা নিজেকে বোঝান আগে। যাহোক, আমাদের ডিএইচইউ যে অবস্থানে আছে সেখানে কোয়ালিটি কস্ট এর হিসাব হচ্ছেনা। আমরা সবাই বলি যে একটা গার্মেন্টস ডিফেক্ট হলে সেটা সারাতে তিনগুণ সময় যায়, দ্বিগুণ সুতা নষ্ট হয়, কাজের মানও খারাপ হয়। এইগুলোর হিসাব কোথায়? আমরা কোয়ালিটি ইন্সপেকশনে যে পরিমাণ খরচ করি, অন্যান্য দেশ কি তা করে? অন্যান্য ফ্যাক্টরী কি তা করে?

এই মুহূর্তে কোয়ালিটি বিভাগকে কোয়ালিটি ইন্সপেকশন ও কন্ট্রোলের পাশাপাশি কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্টে সোচ্চার হতে হবে।

'প্যারেটো পদ্ধতি' বা 'সর্বোচ্চ তিন ডিফেক্ট' পদ্ধতিতে কাজে জোর বাড়াতে হবে। সমস্যা হওয়ার আগেই তা সমাধানের ব্যবস্থা নিতে হবে। অপারেটরের কাজের মানোন্নয়নে নিয়মিত কাউন্সিলিং করা ও জটিল প্রসেসে মোক-আপ বানিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়াটা জরুরী। ফিনিশড্ স্টেশন ইন্সপেকশন কমিয়ে প্রসেস রাউন্ড ইন্সপেকশন সাইকেল বাড়াতে হবে। কোয়ালিটি ইন্সপেক্টরের কাছে ডিফেক্ট আসার জন্য অপেক্ষা করা চলবে না, ডিফেক্ট যেখানে হতে পারে সেখানেই তাকে এগিয়ে যেতে হবে।

এইচআর ও কমপ্লায়েন্স বিভাগঃ আগামী দিনগুলোতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হয়ে দাঁড়াবে এই বিভাগ (আসলে ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে)। আমাদের দেশে এই বিভাগটি পশ্চাদপদ রয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি। অথচ এইচআর বিভাগটাই যে কোন প্রতিষ্ঠানের মূল। এই পশ্চাদপদতার কারণটা আমার মতে এমন- দেখুন আমরা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ দিচ্ছি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, কম্পিউটার কিংবা মেকানিক্যাল স্ব-স্ব বিভাগের জন্য। কিন্তু এইচআর বিভাগে কোন এইচআরএম গ্রাজুয়েট বা পোস্ট গ্রাজুয়েট নেয়ার কথা ভাবছিনা। এখনো আমরা এইচআর এ্যাকাউন্টিবিলিটি নিয়ে ভাবিনা কিংবা কেপিআই ভিত্তিক ব্যবস্থা। আমাদের আগামী চার বছরের কোন মিশন-ভিশন অবজেক্টিভ নেই। এখনো আমরা পলিসি ডেপ্লয়মেন্ট ম্যাট্রিক্স নিয়ে ভাবিনা। অথচ উন্নত বিশ্বে এগুলো ছাড়া একটা প্রতিষ্ঠান ভাবা যায়না। আসলে খেয়াল করে দেখুন, আমাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর পরিবেশ আমরা কতটা উন্নত করেছি নাকি সেটা ছিলো বায়ারের নির্দেশনা? আমরা কি কখনো কমপ্লায়েন্সের খাতে একধাপ এগিয়ে ছিলাম নাকি বরাবর বায়ারের চাহিদা থেকে কয়েক ধাপ পিছিয়ে আছি? আমাদের কি এমন কোন কমপ্লায়েন্স টিম আছে যারা আমাদেরকে এগিয়ে নেবে?

আমরা যদিও এডমিন বিভাগকে একই সাথে দেখি, কিন্তু এটা আসলেই খুব কঠিন একটা ব্যাপার যে, এডমিন-এইচআর ও কমপ্লায়েন্স একই সাথে চলা। খুব একটা সুক্ষ্ম বিভেদ আমি অনুভব করি এই দুইয়ের মাঝে এডমিন এবং এইচআর ও কমপ্লায়েন্স। এডমিন কর্মচারীর প্রতি একটা সীমা রেখা টেনে দেবে, নিয়ম কানুনের কঠোরতা রাখবে, এইচআর সেখানে ঐ সীমারেখার মাঝেই কর্মচারীর সাপোর্টিভ হিসেবে কাজ করবে। এই দুই আপাত দ্বৈরথ একসাথে একই লোকের পক্ষে সম্ভব না। অন্তত আমি এটা নিয়ে নিশ্চিত নই আপাতত।

মজার ব্যাপার হলো, এখানে এডমিন বলতে ফ্যাক্টরী ম্যানেজারই শেষ খাত দাঁড়ায় সময় সময়। কিন্তু এটাই ম্যানেজমেন্টের বড় দুর্বল দিক। এডমিনই হবে প্রতিষ্ঠানের শেষ কথা, এখানে অন্য যে কোন বিভাগ যুক্তি তর্কে অংশ নিতে পারে মাত্র।

যাহোক, এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিষ্ঠানে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা। আমদের একটা বড় দুর্বলতা হচ্ছে, দুপুরের খাবারের বিরতিতে বাসায় যাওয়া। এর ফলে দুপুরের পরে প্রায়শই কিছু শ্রমিক অনুপস্থিত থাকে। একটা ছোট্ট পরিসংখ্যানে আমি দেখেছি এক মাসে গড়ে ১৪০ থেকে ১৪৫টি এমন ঘটনা ঘটে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ঘটনা বিভিন্ন লাইন থেকে হয়, কখনো কখনো একই লাইনে এমন একাধিক ঘটনা ঘটে। এখন আসুন হিসাব করে দেখি, কোন লাইন থেকে এমন একজন অপারেটর যদি না আসেন, তাহলে তার শূন্যস্থান পূরণ করতে মোটামুটি ১ ঘন্টা লেগে যায়। এর ফলে ঐ লাইনের গড় প্রোডাকশন যদি ৮০ পিছ হয় এবং ঐ অপারেটর যদি হেম বা বাটন অর্থাৎ শেষের প্রসেসের অপারেটর হয় তবে ঐ ঘন্টায় ৮০ পিছ প্রোডাকশন হারাতে হচ্ছে। এরপর ঐ শূন্যস্থান পূরণ করতে অন্য লাইন থেকে অপারেটর ম্যানেজ করতে হচ্ছে। এতে দেখা যায় দ্বিতীয় ঘন্টায় ঐ প্রসেসে প্রোডাকশন কম হচ্ছে। ধরি সেখানে ৪০ পিছ প্রোডাকশন হারালাম। এখন যে লাইন থেকে ঐ অপারেটর আনা হয়েছে সেই লাইনে কিছু প্রোডাকশন হারাবো। ধরলাম সেটা ২০ পিছ। তাহলে মোট হারানোর পরিমাণ (৮০+৪০+২০=১৪০ পিছ)।

পরিসংখ্যান আরো বলছে যে গড়ে ৫ দশমিক ৪টি লাইনে এমন অনুপস্থিতির ঘটনা ঘটে। ধরলাম ৫টি লাইনে, তাহলে প্রোডাকশন হারাচ্ছি (১৪০ঃ৫=৭০০ পিছ)। প্রতি পিছ গার্মেন্টস গড়ে ১১০ টাকা মূল্য হিসাবে যা ৭৭,০০০ টাকা। আমরা যদি দুপুরের খাওয়াটা ক্যান্টিনে ব্যবস্থা করি, তাহলে প্রতি শ্রমিককে ২৫ টাকা হারে ২২০০ শ্রমিকের জন্য ৫৫,০০০ টাকা খরচের পর ২০,০০০ টাকা কম লোকসান হবে। ২৫ টাকা ধরলাম কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২৫ টাকায় দুপুরে ভালো খাওয়া যায়। ও হ্যা, এটা কিন্তু ভর্তুকি ব্যতীত। মেন্যুঃ ভাত, ডাল ও মাছ।

ম্যানেজমেন্টঃ আমরা এখনো পিছ হিসাব করে পারফর্মেন্স হিসাব করি। কোন লাইন কতো পিছ করলো তাই দিয়ে বিচার

করি। এটা আমাকে অবাক করে । আমি ইফিসিয়েন্সিকেই এগিয়ে রাখি বরাবর । যেহেতু এটা কিছুটা জটিল । কিন্তু কোম্পানীর আয় ব্যয় দিয়েও তো হিসাব করা যেতো । কে কতো পিছ করেছে সেটা না করে, কে কতো টাকা ব্যয় করে কতো টাকা আয় করলো সেটাও করা যেতো । সে যাক, এখনই সময় পিছ হিসাব করে কাউকে বিচার না করে, প্রফিট রেশিও দিয়ে বিচার করা উচিত । আমি জানি প্রফিট ব্যাপারটার ডাটা শেয়ার করতে ম্যানেজমেন্ট কিছুটা এলার্জি অনুভব করেন, কিন্তু মডার্ন ম্যানেজমেন্টে ট্রান্সপারেন্সিটা জরুরী ।

অন্য সকল বিভাগঃ যাদের কথা বলেছি আলাদাভাবে তারাই মূল ভূমিকা রাখবে । কিন্তু তাই বলে অন্যান্য বিভাগগুলি কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? কক্ষনোই না । এই যেমন দু'য়েকদিন আগেই ফিনিশিং বিভাগের মাহাবুব ভাই তার ফ্লোর থেকে ৩০ জনের মত হেলপার সরিয়ে দিয়েছেন । আয়রন করার সময় তারা বাটন লাগাতো । এখন আয়রনম্যানরাই বাটন লাগিয়ে নেবে । এতে প্রোডাকশন পিছ কমবে এটা নিয়ে যারা চিন্তিত তাদের সময় শেষ । এখন সময় হচ্ছে হিসাব করার যে এতে করে কতটা অপচয় রোধ হচ্ছে । সুইং বিভাগে এটা বলেছি ।

এই ফ্যাক্টরীর সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে । আপনি কাজের মাঝে হুট করে ওয়াশরুমে যাবেন ৫ মিনিটের জন্য, দয়া করে মাথার উপরের ফ্যান, লাইটসহ কম্পিউটারের মনিটরটা বন্ধ করে রেখে যান । ৫ মিনিট পর আবার সুইচ টিপতে হবে এই কষ্টটাই এখন করতে হবে । ক্যান্টিনে চামচ দিয়ে খান, একবার হাত ধোয়ার পানির অচপয় কমে যাবে, এটাই এখন সবাইকে করতে হবে । যে যার অবস্থান থেকে অপচয় কমাতে হবে । লাইনে হেঁটে যাওয়ার পথে পড়ে থাকা একটা ছোট্ট সাইজ লেবেলকে কিংবা বোতামকে আপনি অতিরিক্ত ৩% হিসাবে এড়িয়ে যেতেই পারেন, কিন্তু ঐ পিছটাই হয়তো ইতিমধ্যে ৩.০১%তম পিছ, হতে পারে না এমন? আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কোথায় চাকরি করেন?' আমি বলি, 'ব্যাবিলন গ্রুপ' । পরের প্রশ্নটা এমনই হয়, 'কি কোম্পানী ওটা?' যেই আমি বলি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, তারা বলেন, 'ও গার্মেন্টস'! বিশ্বাস করেন এই 'ও গার্মেন্টস' এ যে তাচ্ছিল্য থাকে তা আমার জন্য সহ্য করা কঠিন । বিভিন্ন দেশে ইয়ংওয়ান, ইয়েশিম, এমএএস এক্টিভ, ব্রান্ডিক্স, হিরডারামানি কিংবা ক্রিস্টাল মার্টিন সব গার্মেন্টস অথচ সে সব দেশে এই সব কোম্পানীতে চাকরি পাওয়ার জন্য সবাই মুখিয়ে থাকে । আর আমাদের? আজ গার্মেন্টসের কেউ যদি অন্য কোন কোম্পানীতে চাকরি পায় চলে যায়, কে? কেন অন্য কোম্পানী থেকে গার্মেন্টসে আসে না?

এই অংশটাই আমার এ লেখার শেষ অংশ । আমি জানি অনেকেই ভ্রু কুঁচকে ভাবছেন, 'লেকচার দেয়া সহজ । সব তো অন্যদের করতে বলছো মিয়া, আরএন্ডডি কি করবে?'

আপনার এই ভাবনা খুবই স্বাভাবিক । আসলে আরএন্ডডি যা করার এতক্ষণ করেছে । এই লেখাটা আপনি পড়ছেন মানে, এটা কথকতায় ছাপা হয়েছে । এটাই তো আরএন্ডডি'র কাজ, আপনাকে চিন্তার খোরাক দেয়া । আপনার এত বছরের অভিজ্ঞতা জমানো মস্তিষ্কে অনুরণন তোলাটা আমার কাজ, সেখান থেকে নতুন যে দিক উন্মোচিত হবে সেটা বাস্তবায়নে আরএন্ডডি আপনার পাশেই থাকবে ।

হৃদয়ের একদিন

এ কে এম গোলাম মহ্‌হী চৌধুরী
সিনিয়র অফিসার, কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট
ব্যাবিলন গ্রুপ

এক

অরবিটাল এডুকেয়ার স্কুল ছুটি হয়েছে ঘন্টাখানেক আগে। স্কুলের সবগুলো রুমে তালা ঝুলছে। স্কুলের আশেপাশে কেউ নেই। শুধু স্কুল মাঠের এককোনে একটা জারুল গাছের ছায়ায় ছোট্ট হৃদয় দাঁড়িয়ে আছে। গাছটার মাথাটা খুব বেশি বাতাসে নড়ছে। তাই বারবার হৃদয়ের গায়ে রোদ পড়ছে। একই সাথে ওর ছায়াটাও গাছের ছায়ার সাথে লুকোচুরি খেলছে। খেলাটা দেখতে হৃদয়ের খুব ভাল লাগছে। তবে গাছের ছায়াটা বড় হওয়ায় বারবার হৃদয়ের ছোট্ট শরীরের ছায়াটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। গত সপ্তাহে ম্যাডাম তাদের আলো ও ছায়া সম্পর্কে শিখিয়েছিলেন। লেসনটা হৃদয়ের ভাল লেগেছিল। 'আলোর চলার পথে যখন নিরেট কোন কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখন তার মধ্যে দিয়ে আলো অতিক্রম করতে পারেনা। ঐ জায়গাটা তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশটুকুই ছায়া।'

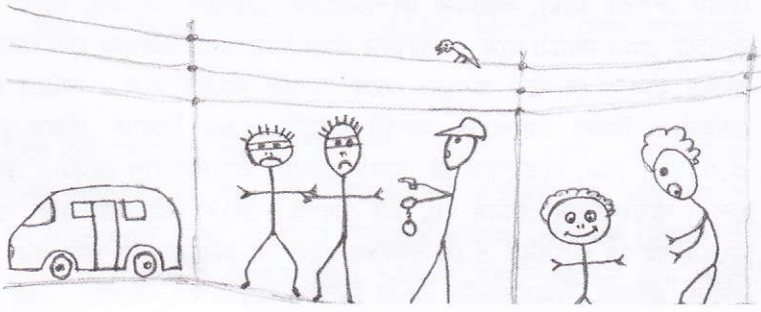

হৃদয় অরবিটাল এডুকেয়ার স্কুল এর স্ট্যান্ডার্ড থ্রী এর ছাত্র। ওর ক্লাসের অন্যান্য বন্ধুদের চেয়ে ওকে অনেক ছোট মনে হয় দেখে। দেখে। তবে বুদ্ধি ও পড়াশুনায় কিন্তু ও মোটেও ছোট নয়। ওর কাধের ব্যাগটা অনেক বড়। দুর থেকে ব্যাগটাকে যা দেখা যায় ব্যাগটার ওজন দুই গুণ হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দাদু এ ব্যাগটা দেখলে সব সময় রেগে যান। দাদুর প্রায় সব ডায়ালগই হৃদয় এর মুখস্ত। 'ঐটুকুন বাচ্চা এত বড় ব্যাগ পিঠে নিয়ে ঘুরলে আর বড় হবে কী?' দাদুর বিশ্বাস ওর ছোট খাটো সাইজের একটাই কারণ ঐ ব্যাগ।

গাছের ছায়াটা মিইয়ে পড়েছে। হৃদয়ের ছায়াটাও এখন একদম অস্পষ্ট।
এইরে, আকাশটা মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। বৃষ্টি হলেতো ঝামেলা, হৃদয় মনে মনে ভাবল।

হৃদয় ঘন্টাখানেক ধরে বিশাল আকৃতির ব্যাগটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্কুল ছুটির পর ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মা বাবার আসতে দেরি হলে হৃদয় এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। এটা মামনি ওকে শিখিয়ে দিয়েছেন। মামনির কখনই দেরি হয়না। অথচ আজ এত দেরি হচ্ছে কেন কে জানে? হৃদয় ওর বাঁ হাতের কব্জার ওয়াচের কভারটা খোলে। এটা অদ্ভুত একটা ঘড়ি। কভার না খুললে সময় দেখা যায় না। সময় দেখে আবার কভার আটকে দিতে হয়। ওর সপ্তম জন্মদিনে বড় চাচ্চু এ ঘড়িটা উপহার দিয়েছেন। সাথে সাথে ও প্রশ্ন করেছিল, আমার ঘড়ি পরে কি হবে? সময় তো চিনিনা। চাচ্চু ওকে সময় চেনা শিখিয়ে দিলেন সেদিনই।

ঘড়িতে এগারটা বেজে পনের মিনিট। স্কুল ছুটি হয়েছে দশটায়। আশ্চর্য, হৃদয় কি করবে বুঝতে পারছেনা। এ জায়গাটা থেকে সরে যাবে কিনা ভাবছে। ব্যাপারটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? কিন্তু না সরেওতো কোন উপায় নেই। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। হটাৎ ওর মাথায় একটা বুদ্ধি আসলো। ওর বাবা মার সেল ফোন নাম্বার তো ওর মুখস্ত। স্কুলের গেটের পাশে দোকানটা, ওখান থেকে ফোন করে খোঁজ নেয়া যেতে পারে। হৃদয়ের একটা অদ্ভুত শখ আছে ফোন নাম্বার মুখস্ত করার। নাম্বার মুখস্ত করার জন্য হৃদয়ের একটা ছন্দ আছে। এই ছন্দটা হল, 'কখ - কখ - গ - কখ - কখ কখ।' এই ছন্দ অনুযায়ী নাম্বার মুখস্ত করলে দ্রুত মুখস্ত হয়ে যায় ওর। তবে কাজটা করে সে খুব গোপনে। যাইহোক, হৃদয় আস্তে আস্তে দোকানটার সামনে এসে দাঁড়ালো। দোকানটার নাম বেশ অদ্ভুত। 'রসালো স্টেশনারি শপ।' নামটা অদ্ভুত কারণ স্টেশনারি শপের সাথে রসালো নামটা যায় না। তবে মিষ্টান্নের দোকান হলে ঠিক ছিল। দোকানের নামের নিচে ছোট করে লেখা- প্রোঃ চাঁন মিয়া। এই 'প্রোঃ' হল প্রোপ্রাইটর এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটা হৃদয় ওর বাবার কাছ থেকে শিখেছে। প্রোপ্রাইটর সাহেবের নাম

নিয়ে মাঝে মধ্যে বিপাকে পড়তে হয় । পুরো নামটা ডাকলে বেমানান লাগে, চাঁন মিয়া আঙ্কেল । একটু ক্ষ্যাত ক্ষ্যাতও লাগে শুনতে । আবার সংক্ষিপ্ত করে ডাকলে হয় চাঁন আঙ্কেল নয়তো মিয়া আঙ্কেল । এগুলো বেমানান, অগত্যা শুধু আঙ্কেল বলে ডাকবে এমনটা ঠিক করেছে হৃদয় । দোকানে গিয়ে মোবাইল ফোন চাইতেই এগিয়ে দিল দোকানদার । প্রথমে মায়ের নাম্বারটা ডায়াল করল সে । আশ্চর্য নাম্বারটা বন্ধ । অথচ এ নাম্বার কখনই বন্ধ থাকার কথা না । এবার ও বাবার নাম্বারে ডায়াল করল । এ নাম্বারটাও বন্ধ । তবে এতে খুব একটা আশ্চর্য হয়নি সে । বাবা প্রায়ই অফিস মিটিংয়ে থাকেন । তাই ফোন বন্ধ রাখতে হয় । কিন্তু এখন কি করা উচিত হৃদয় ঠিক বুঝতে পারছে না । ওদের বাসা খুব বেশি দূরে না । তবে রাস্তাটা সহজ না । যেদিন বাবা অফিস থেকে গাড়ি রিলিজ করে দেয় সেদিন কোন চিন্তা থাকে না । গাড়িতে মামনির পাশে বসে বাসায় চলে যাওয়া যায় । কিন্তু সব দিন গাড়ি আসে না । তখন মামনির সাথে রিকসা করে যেতে হয় । ও হিসাব করে দেখেছে রিকসা দিয়ে বাসায় পৌঁছতে পঁচিশ মিনিটের মত সময় লাগে । হেঁটে গেলে নিশ্চয়ই এক ঘন্টার বেশি লাগবে না । তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা চৌরাস্তার মোড়ে রাস্তা পার হওয়াটা । এ সময়টা ওর খুব ভয় লাগে । বাসগুলোকে বড় বড় দানবের মত মনে হয় ।

স্কুলতো অনেকক্ষণ আগে ছুটি হয়েছে তুমি এখানে এখনও দাঁড়িয়ে আছো কেন বাবু? কোন সমস্যা?
জিজ্ঞেস করল দোকানদার । এই বাবু ডাকটা নিয়ে ভীষণ আপত্তি আছে হৃদয়ের । বাবু ডাকার বয়স কি ওর আছে? হৃদয় চাঁন মিয়া সাহেবের দিকে না তাকিয়ে বলল,
আম্মু নিতে আসেনি ।
ফোন করনি?
করেছি, ফোন বন্ধ ।
মানুষের কান্ডজ্ঞান দেখলে অবাক হতে হয়, এইটুকুন বাচ্চা কি একা বাসায় ফিরতে পারে?

চাঁন মিয়া সাহেবের কথাগুলো পছন্দ হচ্ছেনা হৃদয়ের । মামনির কান্ডজ্ঞান যথেষ্টই আছে । কারণ মামনি আসতে কখনই দেরি করেনা । নিশ্চয়ই আজ কোন সমস্যা হয়েছে । হৃদয় ঠিক করল ও হাঁটতে শুরু করবে । ও আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল । স্কুলের গলিটা পার হয়ে বামে মোড় নিতে হয় । তারপর সরু গলিটা ধরে শেষ মাথায় গেলেই প্রধান সড়ক । প্রধান সড়কের ফুটপাত ধরে ও হাঁটতে শুরু করল । পাঁচ সাত মিনিট হাঁটবার পর সামনের দোকান থেকে এক লোক বেরিয়ে আসলো । লোকটা অনেক লম্বা। গায়ে কালো রংয়ের শার্ট আর জিন্সের প্যান্ট ।
কোথায় যাচ্ছ বাবু-বাসায়? লোকটা জিজ্ঞেস করল ।
আমি বাবু না, আমার বয়স আট বছর । আমার নাম হৃদয় ।
ও আচ্ছা, কোথায় যাচ্ছ হৃদয়?
বাসায় ।
তোমার আম্মু তোমাকে আজ নিতে আসেনি, তাই না?
হৃদয় একটু আশ্চর্য হল । মামনি যে নিতে আসেনি, তা এই লোকটা জানল কি করে? ও জবাব দিল,
হুঁ ।
কিভাবে নিতে আসবেন, তোমার আব্বু তোমাকে নেয়ার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন । হয়তো তোমার মাকেও ফোন করে তা জানিয়ে দিয়েছেন । তাই তিনি আসেননি ।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর হৃদয় প্রশ্ন করল,
আপনি কে?
আমি তোমার আব্বুর অফিসের লোক । আমার নাম আসলাম । আমি তোমাকে বাসায় গাড়ি করে পৌঁছে দিতে এসেছি ।
কিন্তু গাড়ি কোথায়?
ঐতো, লোকটা একটা ছোট্ট মাইক্রোর দিকে নির্দেশ করলো । মাইক্রোর রং লাল ।
আশ্চর্য বাবা তো কখনও এ গাড়ি পাঠায় না । আমাদের তো প্রাইভেট কার ।
আজ প্রাইভেট কার নষ্ট তাই এ গাড়ি । যাও গাড়িতে গিয়ে বস ।

মোটামুটি বুদ্ধিমান যে কোন হৃদয়ের সমবয়সী ছেলেরই উচিত নিশ্চিত না হয়ে গাড়িতে না উঠা । কিন্তু হৃদয় খুব ক্লান্ত । সে

গাড়িতে গিয়ে বসল। তবে ওর মাথায় কিছু প্রশ্ন ঘুরতে লাগল। অবশ্য উত্তরও কল্পনায় ধরে নিল।

প্রথম প্রশ্ন ঃ গাড়ি স্কুলে না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

উত্তর ঃ হতে পারে আসলাম নামের লোকটি রাস্তা চেনে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ গাড়ি আসতে দশ পনের মিনিট দেরি হতে পারে, কিন্তু এত দেরি কেন?

উত্তর ঃ হতে পারে বাবার গাড়ি নষ্ট হওয়ার কারণে কোন ঝামেলা হয়েছে। সে কারণে দেরি।

আসলে হৃদয় মনেপ্রাণে চাইছে গাড়ি করে দ্রুত বাড়ি ফিরে যেতে। তাই ওর অবচেতন মনই এসব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন। একটা ঘুমঘুম ভাব হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

দুই

ফেরদৌসী চোখ খুললেন। তার সমস্ত শরীরে প্রচন্ড ব্যথা। মাথায় একটা ঝিমঝিম ভাব। চোখ খুলতেই বেডের কোনায় লাগানো রডের স্ট্যান্ডটা তার নজরে আসল। তাতে একটা স্যালাইনের ব্যাগ। সেই ব্যাগ থেকে প্লাস্টিকের নল তার বাঁ হাতের সাথে সংযুক্ত। রুমের এককোণে একজন সাদা এপ্রোন পরা মহিলা ডেস্কের উপর রাখা ঔষধের শিশিগুলো গুছিয়ে রাখছেন। তার মানে ফেরদৌসী এখন হাসপাতালে। আর এ সাদা এপ্রোন পরা মহিলা একজন নার্স। হঠাৎ তার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। এক পলকে মনে করতে পারলেন সব। রিক্সা নিয়ে ফেরদৌসী যাচ্ছিলেন হৃদয়কে আনতে। বড় রাস্তার মাথায় তার রিক্সা ইউ টার্ন নিচ্ছিল। ওপাশ থেকে একটা বাস এসে আচমকা ফুল স্পিডে ধাক্কা দিল। ফেরদৌসী রিকসা থেকে ছিটকে পড়লেন। চোখ বুজে আসার আগে কপালের পাশে রক্তের স্রোত দেখেছিলেন। এসব মনে হতেই তার মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেল। ফেরদৌসী হাসপাতালে, তাহলে হৃদয় কোথায়? দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালেন, একটা পয়ত্রিশ। হৃদয় একা বাসায় ফিরতে পারে না, তাহলে ওকি এখনও স্কুলে, নাকি..... । আর ভাবতে পারলেন না ফেরদৌসী। তিনি উঠে যাবার জন্য তড়িঘড়ি করতে লাগলেন।

আরে আরে কী করছেন ! সিস্টার ফেরদৌসীকে ধরে ফেললেন।

আপনার মাথায় আঘাত গুরুতর। অনেক ব্লিডিং হয়েছে। আপনি এখন উঠতে পারবেন না।

সিস্টার ফেরদৌসীকে শুইয়ে দিলেন। ফেরদৌসী ছটফট করতে লাগলেন। এক্সিডেন্টের স্পটে তার মোবাইল ফোন পাওয়া যায়নি। শেষমেষ সিস্টার হাসপাতালের ফোন থেকে কল করার সুযোগ করে দিলেন। ফেরদৌসী হৃদয়ের বাবা কায়সার রহমানকে ফোন করলেন। মোবাইল ফোন বন্ধ। এবার তিনি অফিসের নাম্বারে ফোন করলেন। ওপাশ থেকে নারী কন্ঠ শোনা গেল।

হ্যালো, আস্সালামু আলাইকুম।

ওয়ালাইকুম আস্সালাম। কায়সার সাহেবকে একটু ডেকে দিবেন প্লিজ।

স্যার তো একটা ইম্পর্টেন্ট মিটিংয়ে আছেন।

প্লিজ ওনাকে কিছুক্ষণের জন্য ডেকে দিন। ইটস্ ইমারজেন্সি। আমি তার ওয়াইফ।

আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাডাম। আপনি হোল্ড করুন।

প্রায় তিন মিনিট হোল্ড করার পর কায়সার ফোন ধরলেন।

হ্যালো.....

হ্যালো, শোন আমি হৃদয়কে স্কুল থেকে আনতে যাওয়ার পথে এক্সিডেন্ট করেছি।

মাই গুডনেস। তুমি এখন কোথায়?

হক মেডিকেয়ারে। আমি এতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম। হৃদয়কে স্কুল থেকে আনতে পারিনি। ও স্কুলে আছে না বাসার পথে রওনা হয়েছে কিছুই জানিনা।

কথাগুলো বলার সময় ফেরদৌসী আতঙ্কে কেঁদে ফেললেন।

ও কে। আমি আগে হৃদয়ের স্কুলে যাচ্ছি। সেখান থেকে হৃদয়কে নিয়ে হাসপাতালে আসছি। তুমি চিন্তা করোনা। রেস্ট নাও।

আধঘন্টা পর কায়সার হাসপাতালে ফেরদৌসীর সাথে দেখা করলেন। তিনি প্রথমে স্কুলে তারপর বাসায় গিয়েছেন। হৃদয়কে কোথাও পাননি। শুধু স্কুলের পাশের দোকানদারের কাছে শুনেছেন হৃদয় তাদের ফোন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের

ফোন বন্ধ ছিল।

ফেরদৌসীর কান্না থামানো যাচ্ছিল না। তার কান্নার সাথে তাল মিলিয়ে ঝুমবৃষ্টি নামল। হৃদয় কাছে থাকলে এখন নিশ্চয়ই কায়সারকে জিজ্ঞেস করত, 'বাবা ঝুমবৃষ্টি ইংরেজি কি?' কায়সার তখন বলতেন, 'ঝুমবৃষ্টি ইংরেজি জানিস না! ক্যাটস্ এন্ড ডগস্।' শুনে নিশ্চয়ই হৃদয় হেঁসে কুটি কুটি হত। ক্যাটস্ এন্ড ডগস্ মানে তো 'বিড়াল এবং কুকুর।' ঝুমবৃষ্টি হয় কি করে ? কায়সার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

তিন

হৃদয় যে ঘরে বসে আছে সে ঘরটা ভীষণ অন্ধকার। এখন কি দিন না রাত বোঝা যাচ্ছেনা। হৃদয় প্রথমে বুঝতে পারেনি যে তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। কিন্তু যখন ও দেখল ওর হাত পা যে চেয়ারটায় সে বসে আছে তার সাথে বাধা, তখন সে বুঝে নিয়েছে। কিডন্যাপ শব্দটা খুব মজার। কিড মানে শিশু আর ন্যাপ মানে ঘুম। তাহলে কিডন্যাপ এর অর্থ দাঁড়ায় 'শিশুর ঘুম।' অথচ এর আসল অর্থ কারও অমতে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া। হাত পা বাধা অবস্থায় সে কতক্ষণ আছে তা সে জানে না। অনেকক্ষণ এমন অবস্থায় থাকার পর কেউ একজন এ রুমে প্রবেশ করল। একে হৃদয় চেনে। এই লোকই তাকে নিয়ে এসেছে। 'আসলাম।'
কি হৃদয়, কেমন আছো?

অন্য যে কেউ হলে লোকটার ভালমানুষী কথায় রেগে যেতো, কিন্তু হৃদয় সহজে বিরক্ত হয় না। সে শান্ত গলায় জবাব দিল, ভাল আছি।
আমাকে দেখে কি তোমার ভয় করছে?
না।
ভয় করবে। যখন জানবে আমি কত ভয়ঙ্কর লোক তখন ভয় করবে।
হ্মি, আচ্ছা।
এখন বলতো আমরা তোমাকে এখানে ধরে এনেছি কেন? লোকটার মুখে একটা সুক্ষ্ম হাসির রেখা।
কারণ আপনি ব্ল্যাকমেইল করে আমার বাবা মা'র কাছ থেকে টাকা আদায় করতে চান।

ব্ল্যাকমেইল শব্দটা মাথায় আসতেই হৃদয়ের হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। ব্ল্যাক মানে কালো আর মেইল মানে চিঠি, তাহলে ব্ল্যাকমেইল মানে কালো চিঠি। অথচ বাবা বলেছিল ব্ল্যাকমেইলের আসল অর্থ– কারো দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোন উদ্দেশ্য পূরণ করা। হৃদয় হাসি আটকে রাখলো।
চমৎকার, তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে।
হৃদয় কোন কথা বললো না। কিছুক্ষণ আসলাম কার কার সাথে যেন কথা বলল। তার মর্মার্থ এই, আজ রাতেই হয়তো কোন অপারেশন আর মাল রাতেই রিলিজ হবে। তারপর আসলাম আবার হৃদয়ের দিকে তাকালো।
আচ্ছা, আপনার নাম কি সত্যিই আসলাম?
হ্যাঁ, তবে প্রথম অংশ বাকি আছে। আমার পুরো নাম ত্যাড়া আসলাম।
ও আচ্ছা, ত্যাড়া আসলাম আঙ্কেল, আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে।
আসলাম একজন লোককে ডাকলো, ডাক শুনে বুঝা গেল এর নাম নিজাম। নিজাম এসেই তির্যকভাবে একবার হৃদয়ের দিকে তাকালো। লোকটা ভীষণ কালো। দেখলেই বলে দেয়া যায় এ লোকটা বহু মানুষ খুন করেছে। চোখ দু'টো ভয়ঙ্কর। আসলাম তার কানে কি যেনো ফিসফিস করলো। লোকটা বাইরে চলে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সে কলা আর রুটি নিয়ে এলো, সাথে এক বোতল মিনারেল ওয়াটার। অন্য যে কেউ হয়তো এ খাবারকে তুচ্ছ মনে করতো কিন্তু হৃদয় আগ্রহ নিয়ে খেতে শুরু করল।
এখানে অন্য কিছুর ব্যবস্থা নেই, আসলাম বলল।
এটাতো ভাল খাবার। 'ক্লান্ত অবস্থায় শর্করা জাতীয় খাবার খুব উপকারী।'

নিজাম ওর হাতের বাধন খুলে দিল। আশ্চর্য ওর বাঁ হাতে কব্জার ওয়াচটা নেই।

আসলাম এবার অবাক হয়ে বলল,
তুমি এত কিছু শিখেছ কোথায়?
আমাদের স্কুলে সপ্তাহে একবার 'হেলথ এন্ড সেনিটেশনের' ওপর ক্লাস হয়, সেখানে শিখেছি।
ও আচ্ছা, এখন শোনো তোমার বাবাকে তুমি ফোন দেবে। তোমার বাবার কাছ থেকে আমি 'পাঁচ লাখ টাকা' চাইব তোমার মুক্তিপণ হিসেবে।
জ্বি, আচ্ছা।
তাকে ফোনে বলবে, তোমাকে আমরা এখানে আটকে রেখেছি। তারপর আমি তাকে সব বুঝিয়ে দেব। মনে রাখবে আমার কথা শুনলে তুমি নিরাপদ আর না শুনলে.....

কথা শেষ না করেই আসলাম প্যান্টের পেছন থেকে একটা চাপাতি বের করল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে হৃদয় শিউরে উঠল। লোকটার ভদ্রতার মুখোশ আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে।

আচ্ছা আঙ্কেল, আমার বাবা যদি টাকা না দেন তাহলে কি আমাকে মেরে ফেলবেন?
তোমার দুইটা কিডনি আর দুইটা চোখ কেটে বিক্রি করে ফেলব। এ কথা বলেই সে তড়িঘড়ি করে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পর আসলাম আবার ফিরে আসল। এসেই হৃদয়কে ধাক্কা দিল। হৃদয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ও জেগে আশ্চর্য হয়ে আসলামের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটার চোখ টুলুটুলু। গা থেকে বিশ্রী গন্ধ বের হচ্ছে।
ঐ তোর বাবার নাম্বারটা বল।
ঐ চুপ ক্যান, তোর বাপের নাম্বার বল।
হৃদয় ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকালো। সেখানে একটা টিমটিমে বাতি জ্বলছে। ঘরের আলো বাড়ানোর বদলে অন্ধকার যেন আরো বেড়ে গেছে লাইটটার জন্য।
ঐ কথা কানে যায়না?
হৃদয়ের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল আসলাম। হৃদয় নাম্বার বলতে শুরু করল তার নিজস্ব ছন্দে, ০১ ৭১ ২ ৯৯ ৩১ ৩৬।

হৃদয়ের বলা নাম্বারগুলো দ্রুত ডায়াল করল আসলাম। ওপাশ হতে ফোন রিসিভ হতেই আসলাম হৃদয়ের হাতে ফোনটা দিয়ে দিল। হৃদয় বলতে শুরু করল,
'হ্যালো, বাবা আমি হৃদয়। বাবা প্রথমেই বলে রাখি তুমি কোন কথা বলবে না শুধু শুনবে। আর যদি বল তুমি কিছুই জানতে পারবে না।'
আসলাম খেঁকিয়ে উঠল।
ঐ ছুঁচো, কি বলতেছিস। যা শিখাইছি তা বল।

হৃদয় বলতে শুরু করল।
'বাবা, আজ সকালে আমাকে স্কুলের কাছ থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আসলাম আঙ্কেল আমাকে আটকে রেখেছে। তার আসল নাম ত্যাড়া আসলাম। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি আঙ্কেলের কথা শোন তারপর সে যে ঠিকানা দেয় সেখান থেকে আমাকে নিয়ে যাও।'

এবার আসলাম হৃদয়ের হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিল।
হ্যালো.....
জ্বি, বলুন।
'পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে আমার সাথে দেখা কর আজ রাতের মধ্যেই। রোড ১৫ বাড়ি ৯, উত্তরা। এই ঠিকানায়। টাকাটা ক্যাশ চাই।'
জ্বি, আচ্ছা।
আর ভুলেও পুলিশে খবর দেওয়ার চেষ্টা করিস না। যদি তেড়িবেড়ি করিস তাহলে তোর ছেলের মাংসের কাবাব

তোর বাসায় পৌঁছাইয়া দেব।
কথা না বাড়িয়ে ফোন কেটে দিল আসলাম। ফোন কেটে দিয়ে ও হৃদয়ের দিকে তাকালো। যে চাহনিতে হৃদয়ের ভয়ে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার কথা। অথচ আসলাম আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল হৃদয়ের মুখে হাসি। 'ক্ষুধাতুর, ঘুমকাতর কোন শিশুর মুখে এমন হাসি বড় বেমানান।'

চার

রাত ১২টা বেজে পঞ্চান্ন মিনিট। কায়সার নিজের বাসায় পায়চারি করছেন। তিনি ভীষণ ক্লান্ত। আর ফেরদৌসী সোফায় বসে অঝোর ধারায় কাঁদছেন। তার মাথায় ব্যান্ডেজ। হৃদয়ের দাদু ফুপির বাসায় গিয়েছিলেন। খবর শুনে ছুটে এসেছেন। আরও অনেক আত্মীয়-স্বজন তাদের বাসায় এসেছেন। তারা সবাই ফেরদৌসীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। দাদুর হাতে তজবী। তিনি বাবা ফরিদ শাহের দরগায় দু'টি খাসি জবাই দেয়ার মানত করেছেন। তিনি বড় করে দোয়া ইউনুস পড়ছেন। 'এই দোয়া বিপদ কাটায়। ইউনুস নবী এই দোয়া পড়ে মাছের পেট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।'

এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঢাকার সব থানায় ফোন দেয়া হয়েছে। কায়সার থানায় জিডি করেছেন। সবগুলো বড় হাসপাতালে খোঁজ নেয়া হয়েছে। কোথাও হদিস মেলেনি হৃদয়ের। কায়সার ফোন হাতে নিয়ে দ্রুত পায়চারি করছেন। তার আশা এখনই হয়তো মুক্তিপণ চেয়ে কোন ফোন আসবে। অথচ কোন ফোন আসেনি।

ফেরদৌসীর এ মুহূর্তে কি করণীয় তা তিনি বুঝতে পারছেন না। শুধু মনে মনে একটাই প্রার্থনা করছেন-
হে খোদা, আমার ছেলে নিষ্পাপ ও যেন ভাল থাকে। মায়ের কোমল মনের এ প্রার্থনার সাথে দেয়ালের টিকটিকিটাও সম্মতি জানিয়ে টিক্ টিক্ করে উঠল।

পাঁচ

রাত কত বোঝা যাচ্ছে না, তবে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুনে বোঝা যায় রাত অনেক গভীর। আসলাম হৃদয়ের সামনে বসে আছে। হৃদয় কথা শুরু করল,
আচ্ছা আঙ্কেল, আপনার জন্য একটা কুইজ, 'ঝিঁঝিঁ পোকার ইংরেজি নামটা খুব মজার। একটা খেলার সাথে মিল আছে।'

আসলামের হাতে একটা বোতল। বোতল থেকে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ বের হচ্ছে। আসলাম বোতল থেকে কিছুক্ষণ পরপরই কিছু একটা পান করছে। সে টলতে টলতে জবাব দিল,
বলতে পারিনা, তুই বইলা দে।
জানেন না! উত্তরটা হল 'ক্রিকেট।'
ও আচ্ছা তোর অনেক বুদ্ধি।
আপনারও তো অনেক বুদ্ধি।
কিভাবে বুঝলি?
এই যে, আমাকে রাস্তায় দেখেই বুঝে গেলেন মামনি আমাকে নিতে আসেনি।
তোর মত একটা বাচ্চা পোলা ব্যাগ কাঁধে করে একা একা হাঁটলে সহজেই সেটা অনুমান করা যায়।
আর বাবার গাড়ির কথাটা যে বললেন, কিভাবে জানলেন?
আজকাল শহরের স্কুলে পড়া বেশির ভাগ পোলাপানের বাপ মারই গাড়ি থাকে। তাই এটা আন্দাজে ঢিল মারছি,
আসলাম জবাব দিল।
কিন্তু ঢিলটা ঠিক জায়গায় পড়েছে, তাই না?
হ্যা, ঠিক বলেছিস।

আচমকা নিজাম ঘরে ঢুকলো। তার চোখ দেখে মনে হচ্ছে সে ভীষণ ভীত। সে দৌড়ে এসে আসলামকে বলল,
'বস, র‍্যাব বাড়ির চারদিকে ঘিরা ফালাইছে। মনে হয়, এই পিচ্চি হালার বাপে গড়বড় বাধাইছে।'
নিজাম ভয়ে কাঁপছে। মুহূর্তের মধ্যে আসলামের মুখ রক্তশুন্য হয়ে যায়। সে কষে হৃদয়ের গালে একটা চড় মারল।

হৃদয় চেয়ারসহ পড়ে গেল মেঝেতে। আসলাম চিৎকার করে বলল,
'তোর বাপে কাজটা ভাল করে নাই। সে পস্তাইব এর জন্য।'

হৃদয় পড়ে গেলেও দৃষ্টি আসলামের দিকে। সে দৃঢ় কণ্ঠে বললো,
আমার বাবা তো কিছু করেননি আঙ্কেল।
করেছে, তোর বাবা র‍্যাবে খবর দিছে।
হৃদয় এবার একটু মৃদু হাসলো।
না আঙ্কেল, বাবা র‍্যাবে খবর দেয়নি, দিয়েছেন আপনি।
আমি !
আসলামের চোখ কোঠর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়।
হ্যা, ঐ যে ফোনে এখানকার ঠিকানা আর বর্ণনা দিলেন, ঐ নাম্বারটা ছিল র‍্যাব-৪ এর ফোন নাম্বার। ঢাকার সবগুলো র‍্যাব স্টেশনের নাম্বার আমার মুখস্ত। আমরা বাবার সাথে কথা বলিনি, বলেছি র‍্যাব কমান্ডারের সাথে।

আসলামকে এবার হিংস্র বাঘের মতো মনে হলো। তবে হিংস্র বাঘের চেহারায় ভয়ের ছাপ থাকে না। তার চেহারায় ভয় এবং হিংস্রতা উভয়েরই ছাপ আছে। সে চাপাতি নিয়ে এগিয়ে আসলো। হৃদয় চোখ বন্ধ করে ফেললো। দু'আ ইউনুস দাদি শিখিয়ে দিয়েছিলেন, পুরোটা মনে পড়ছে না শুধু শেষটা মনে পড়লো, 'ইন্নি কুন্তু মিনাজ যোয়ালিমিন।' এর পরপরই দু'টো ফায়ারের শব্দ 'ঠাশ-ঠাশ।' মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আসলাম। ফায়ার করা হয়েছে কাঁচের জানালার বাইরে থেকে। হয়তো র‍্যাবরা টার্গেট করে রেখেছিল আসলামকে।

র‍্যাব-৪ এর সদস্যরা হৃদয়কে বাধা অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন। গ্রেফতার করলো ত্যাড়া আসলামের দুই সহযোগীকে।

ছয়

পরের ঘটনাগুলো বেশ সংক্ষিপ্ত। রাত তিনটায় র‍্যাব অফিস থেকে ফোন পেয়ে সেখানে ছুটে গেলেন কায়সার আর ফেরদৌসী। গিয়ে দেখেন র‍্যাব এর ক্যাপ্টেনের সামনে বসে আছে হৃদয়। হৃদয়কে জীবন্ত দেখে মা বাবার কোমল প্রাণ আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে উঠল। আর হৃদয়.. সে যে কি করলো, আচমকা চিৎকার দিয়ে মা বাবাকে জড়িয়ে ধরলো। মা ছেলেকে বুকে টেনে নিলেন। চলে আসার আগে হৃদয় কমান্ডারকে বললো,
থ্যাঙ্কইউ আঙ্কেল, ফোনে আমার বাবার অভিনয় করার জন্য।

পরেরদিন সবগুলো পত্রিকায় ছবিসহ সংবাদ এল, 'একটা ছোট্ট ছেলের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় কুখ্যাত সন্ত্রাসী ত্যাড়া আসলাম নিহত, গ্রেফতার সহযোগী দুই জন।'

স্মৃতিকথায় দাদাভাই

পুতুল বাড়ৈ
মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট
সুরভী গার্মেন্টস লিমিটেড

আজ থেকে প্রায় চার বছর আগের কথা। তবুও মনে হয় এইতো সেদিনের কথা। আর এই কথাগুলো আমাকে কুরে কুরে খায়। কথাগুলো আমার দাদাভাইয়ের- আমার দাদাভাই স্বপনের। চার বছর আগে একদিন দাদা আমার জন্য চাল নিয়ে ঢাকায় আসে। ঐ দিনই দাদাভাই এক সময় বলে, পুতুল কিছুদিন ধরে আমার জ্বর হয়, কিন্তু জ্বরটা ছাড়ে না। আমি জিজ্ঞেস করি, কতদিন ধরে এই জ্বর? দাদাভাই বলে, একটু একটু করে প্রায় ছয়-সাত দিন যাবৎ। এই কথা শোনার পর দাদার হাতে পাঁচশত টাকা তুলে দিয়ে বলি, আজই তুমি রক্ত পরীক্ষা করে আসো।

পরের দিন ঠিকই দাদাভাই রক্ত পরীক্ষা করতে দেয় প্যাথলজাবে। এরপর মুখ কালো করে রিপোর্ট নিয়ে বাসায় আসে। দাদার চেহারা দেখে আমার মেজদিদি বলে, কিরে তোর মুখ এতো কালো কেন? দাদাভাই ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে বলে, আমার রিপোর্ট ভাল না। আমার হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস ধরা পড়েছে। মেজদিদি বলে, তাতে কি হয়েছে- আমারওতো হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস আছে। দাদাভাই বলে, তোর তো অনেক টাকা আছে। কিন্তু আমার কি অবস্থা হবে? আমি কিভাবে এতো টাকার ওষুধ খাবো? তখন আমার মেজদিদি বলে, আমি ওষুধ খেতে পারলে তুইও পারবি।

এরপর আগের রিপোর্ট ঠিক কি না তা নিশ্চিত হওয়া এবং আরো কিছু পরীক্ষার জন্য দাদাভাইকে আবারো পাঠানো হয় ডায়াগনস্টিকে। রিপোর্ট তৈরি হলে ওখানকারই এক ডাক্তারকে দেখানো হয়। রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বলেন, এই রোগীর লিভার ক্যান্সার হয়েছে। ডাক্তারের কথা শুনে আমাদের সবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। আমরা ডাক্তারকে বলি, কিভাবে তা সম্ভ? আমার দাদাভাইয়ের তো কখনও খারাপ লাগেনি, খাওয়ায় অরুচি হয়নি।

তখন ডাক্তার বলেন, আসলে এই হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস হলো একটা নীরব ব্যাধি। এই রোগ বেশি দিন শরীরে থাকলে আস্তে আস্তে তা লিভারকে নষ্ট করে দেয়। পরে তা লিভার ক্যান্সার বা লিভার সিরোসিসে পরিণত হয়। এ কথা শোনার পর দিশা না পেয়ে দাদাভাইকে নিয়ে গেলাম মিরপুর ক্যান্সার হাসপাতালে। সেখানেও সেই একই রিপোর্ট আসলো। সেখানকার ডাক্তার ম্যাডাম বললেন, এই রোগীকে কেমোথেরাপি দিন। আমরা কেমো না দিয়ে দাদাভাইকে ভর্তি করালাম ধানমন্ডি প্যানোরমা হসপিটালে। এখানে তারা একটা এন্ডোসকপি করে। এই এন্ডোসকপি করার পর দাদার মনে একটু ভয় ঢুকে যায়। সে কয়েকবার কান্নাও করে। আসলে আমরা কেউ ভাবিনি যে সত্যিই দাদাভাইয়ের কোন কঠিন রোগ হয়েছে এবং সে আর বাঁচবে না। প্যানোরমা হসপিটালে পনের দিন থাকার পর ডাক্তাররা বললেন অপারেশন করতে। অপারেশনের কথা শুনে দাদাভাই অস্থির হয়ে যায়। অপারেশন করাতে চায়। কিন্তু আমরা কেউ রাজি ছিলাম না অপারেশনের জন্য। কিন্তু দাদাভাইয়ের কাকুতি মিনতিতে অবশেষে ওকে ভর্তি করানো হয় ঢাকা গ্যাস্ট্রোলিভার হসপিটালে।

গ্যাস্ট্রোলিভার হসপিটালে ভর্তির পর ডা. মবিন খান বললেন, 'এই রোগীর লিভার ২০% ভাল আছে। অপারেশন করালে হয়তো চার-পাঁচ বছর বেঁচে থাকবে।' এই কথা শোনার পর আমরা সিদ্ধান্ত নেই অপারেশন করাবার। অপারেশনের দিন ঠিক হয়। ঐ দিন রক্তের জন্য আমরা চার-পাঁচ জন লোক রাখি, রক্তও রাখি ২ ব্যাগ। বিকেল পাঁচটায় অপারেশন। কিন্তু তার আগেই আমরা সব ভাই-বোন ও মা মিলে কত যে কান্নাকাটি করেছি, প্রার্থনা করেছি তা কোনদিন ভুলতে পারবো না। দাদাভাই এই সময় বলে যে হয়তোবা অপারেশনের জন্য তাকে যে অজ্ঞান করবে সেই জ্ঞান আর তার ফিরবে না। ঐ সময়টাতে আমাদের উপর দিয়ে যে কষ্টের নদী বয়ে গেছে তা হয়তো কেউ অনুভব করতে পারবে না।

অপারেশনের আগে দাদাভাইকে ওটি পোশাক পরানো হয় । পোশাক পরে ট্রলিতে না চেপে একা হেঁটে দাদাভাই ওটিতে ঢুকে যায় । এদিকে আমাদের সবার গলা শুকিয়ে যায় । বারবার মনে হয়, না জানি কখন কোন্ খবর আসে । দীর্ঘ চার ঘন্টা ধরে অপারেশন শেষে দাদাভাইকে অবজারভেশন কক্ষে রাখে । সেখানে গিয়ে দাদাভাইয়ের সাথে কথা বলি আমরা । দাদাভাই বলে, আমার খুব খারাপ লাগছে । আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না । আমরা সবাই সান্ত্বনা দেই তাকে । আসলে ঐ সময় আমরাও জানতাম না যে দাদাভাইয়ের লিভার ২০% ও ভাল ছিলো না । অপারেশন করে পুরোটাই কেটে বাদ দিয়েছে ।

পরের দিন রোগীকে বেড়ে নিয়ে আসা হয় । তিন দিন পর্যন্ত তাকে শুধু স্যালাইন দেয়া হয় । সাতদিন পর আমরা দাদাভাইকে বাসায় নিয়ে আসি । ড্রেসিং করাবার জন্য প্রতিদিন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হতো । কিছুদিন পর অপারেশনের জায়গায় ইনফেকশন হয়ে যায় । ইনফেকশন হওয়ার পর থেকে দাদাভাই আর কিছু খেতে পারেনা । আস্তে আস্তে শরীর শুকিয়ে যায় । হঠাৎ একদিন ডাঃ মবিন খান বলেন, এই রোগী সম্ভবত আর সপ্তাহখানেক বাঁচবে । ওনাকে আপনারা গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যান । গ্রামের আবহাওয়ায় হয়তো আরও কিছুদিন বেঁচে থাকবে ।

এ কথা শোনার পর দাদাভাইকে নিয়ে এ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়ি রওনা হই । পথিমধ্যে তিন চারবার অজ্ঞান হয়ে যায় দাদাভাই । পথে মামাবাড়ি থাকায় তারা তাদের বাড়ি নিয়ে যান আমাদেরকে । খবর পেয়ে অনেক মানুষ চলে আসে মামাবাড়িতে দাদাভাইকে দেখতে। পরের দিন রোদ ওঠার আগে দাদাভাইকে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হই । আমাদের বাজারে পৌঁছে দেখি লোক আর লোক। দেখে অবাক হই–এতো মানুষ আমার দাদাভাইকে ভালোবাসে! এতো মানুষের চোখের পানিতে কি আমার দাদাভাই ভালো হয়ে উঠবে? যাহোক সবাই দাদাভাইকে একটা নৌকায় তুলে নৌকা কাঁধে করে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে । এনে বাবার মন্দিরের সামনে রেখে সবাই মিলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে ঘরে নিয়ে যায় দাদাভাইকে ।

গ্রামের বাড়িতে এসে একটা আশ্চর্য ব্যাপার হলো– ঢাকাতে দাদাভাই ভাত একটুও খেতে পারতো না, এখানে তা পারে । প্রথম দুই একদিন পরে অবশ্য আর খেতে পারলোনা । ক্রমে তার অবস্থা খারাপ হতে থাকে । এক সময় বাথরুমে আর যেতে পারে না । বিছানাতেই সারতে হয়। একদিন দাদাভাইয়ের ভীষণ শ্বাসকষ্ট হয় । তাকে বরিশাল সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। দাদাভাইকে খাইয়ে দিতাম আমি । আমার হাতে ছাড়া ও অন্য কারো হাতে খেতে চাইতো না । পরীক্ষার সাজেশন নেবার জন্য এক সময় আমি ঢাকা চলে আসি । কিছুদিন পর দাদাভাইকে আবার বাড়িতে নিয়ে আসা হয় । খবর পাই বাড়িতে আমাকে না দেখে দাদাভাই আর খেতে চায় না । 'আমাকে খাইয়ে দিতে পুতুলের অনেক কষ্ট হয়েছে । তাই ও ঢাকা চলে গেছে । আমি এখন না খেয়ে মারা যাবো ।' মা আমাকে ফোন করে এ সব কথা বলেন ।

এরপর আর আমার ঢাকায় থাকা চলে না । আমি বাড়ি যাবার সিদ্ধান্ত নেই । কিন্তু হায় ! আমার চরম দুর্ভাগ্য দাদাভাইয়ের মুখ আর দেখা হয় না । তার মুখে খাবার তুলে দেবার সুযোগ আর হলোনা আমার । ঐ দিনই রাত ১:২০ মিনিটে দাদাভাই আমাদের ছেড়ে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেয় । আমাদের বিশ্বাস হয় না যে দাদাভাই আর নেই । টুকরো টুকরো অজস্র স্মৃতি এসে আমার কষ্ট বাড়িয়ে দেয় । আমার প্রিয় দাদাভাইয়ের কথা লিখে শেষ করা যাবে না । তবে এই সুযোগে আমার পাঠক পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে দু'টি কথা বলতে চাই । হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস একটি নীরব ঘাতক রোগ, যা ধীরে ধীরে লিভারকে নষ্ট করে দেয় । তাই আমার সবার কাছে অনুরোধ–আপনার শরীরে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস আছে কিনা তা রক্ত পরীক্ষা করে জেনে নিন । যদি না থাকে তো এই ভাইরাসের ভ্যাকসিন নিয়ে নিন । আমি চাই না যে আমার ভাইয়ের মতো আর কেউ এমন করে রোগে ভুগে অকালে মৃত্যুবরণ করুক । আমার মত কেউ ভাইহারা হোক । আমার মায়ের মতো কেউ পুত্রহারা হোক । আবারো অনুরোধ করি কষ্ট করে হলেও আপনারা সবাই হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস পরীক্ষা করান । ভ্যাকসিন নিয়ে নিজে বাঁচুন, অন্যকেও বাঁচতে শেখান ।

A Business Trip To Capetown, South Africa

Muhammad Saiful Hoque
AGM, Marketing & Merchandising
Babylon Group

Last year I couldn't produce any writing for Babylon Kathokata, my favorite in-house annual magazine. Moreover, I couldn't even attend the unwrapping ceremony of 7th Publication of the magazine for a quotation meeting in HK. So I started feeling like a distance was being created between the magazine and myself, which I couldn't afford for long. So I was determined to write something for the 8th Publication to minimize the gap with Kathokata. Fortunately for me I got a fantastic topic at the beginning of this year. There was an invitation for attending Woolworths Supplier Conference on 22nd & 23rd of February'13 in Cape Town, SA. The mere thought of visiting a great organization, a wonderful city and a new country, thrilled me. The visit schedule was finalized to take place between 19th to 25th Feb'13; it was a weeklong trip to the city of Cape Town.

We were three members in the team and my co-travelers had accepted me as their guide for the tour. No wonder I was senior to them by age.

We started the journey on 19th Feb'13 evening and incidents started following us from the very beginning. In the Hazrat Shahjalal International Airport we stood in the queue for immigration after the boarding passes were issued to us. We were intently watching the activities of the immigration officer of the counter we queued up and soon realized that we had chosen the wrong queue. The queue had the least number of passengers but the immigration officer on duty was the slowest. Indecision was written all over his face. It took us almost an hour and a half to face the officer following the trail of only 12 to 13 people in the queue. The immigration officer somehow sensed our impatience and could probably guess that, that was related to his rather slow actions.

He explained to me the reason of his taking time when I reached him for my immigration formalities. He introduced himself as a sincere officer and said that some travelers provided too much confusing information and that actually killed time. According to him most of his colleagues did not bother to follow the rule and as such got show cause letters from the higher authority for negligence of duty. They didn't get promotion for their carelessness but he cared for his promotion. That was why did his job sincerely.

I was patiently listening to the officer. I wouldn't have shared his story today if he had not regretted processing our immigration finally.

He looked at my visa and then asked, 'Where do you want to go?' I answered with a mild smile, 'South Africa.' He seemed nervous and was looking at the other visa pages and questioned if I had visited the country before. After getting my reply in the negative he exclaimed, 'Oh! You also put me in trouble. Let me report this to my boss.' He was looking for his boss. I told him that we were three together and my co-travelers were leaving the country for the first time. He was frustrated beyond measure and promptly returned my passport. He then gestured me to follow his boss.

My teammates followed me and it's difficult to express how my mates and I looked at that time. However, I told the senior officer boldly that we had lost lot of our time standing in the queue for the officer's slow actions and now we didn't have any time left to waste. I pressed him to decide quickly as we had only 20 minutes to catch the flight. After several back and forth communications, the unimpressive officer in-charge of the airport finally proposed to me that I signed an undertaking as a solution to the crisis. I thought I didn't have a choice so I agreed to the proposal with my utter reluctance. I really couldn't appreciate this attitude of the immigration people when we all three had valid visas, necessary papers and no police case was there against any of us. We felt helpless for the time being in that situation. The flight was delayed by half an hour, so we didn't need to run after the valuable immigration permission.

Flight from Dhaka to Dubai was just under 5 hours. We experienced another exceptional incident during this flight. Dubai was only about an hour away and I was leaning on my seat drowsing. Suddenly I was awakened by a scream, which came from a female passenger. I opened my eyes and saw a tall man who had just fallen down on the aisle in front of me. I was frightened. The man tried to get up in vain and fell down again. The cabin crew came rushing to the spot and helped him to his seat. The paramedics in the plane started taking care of the man. Sometime later an announcement came through the PA system of the aircraft if there was any doctor among the passengers. A lady from the passengers came forward to attend the ailing man. The attention of the rest of the passengers remained focused on the unlucky passenger till we reached Dubai. We left the sick passenger behind us as the plane landed, wishing him to recover soon from whatever illness he was suffering from.

There was a three-hour transit break in Dubai before we boarded the plane for Cape Town. In the earlier flight from Dhaka we had seen many Bangladeshis around us but this time we found only one besides us in the entire plane. The flying time was ten hours from Dubai to Cape Town and we finally reached there safely without further incidents. It's mentionable that we didn't need more than 10 minutes to complete the immigration for our team in Cape Town airport in South Africa. This reminded me of the time consuming & painful immigration experience in my home country.

True Alliance people were waiting for us in the airport. They were taking us through a hilly road and we were moving uphill. I felt nervous fearing about what would happen if something like a brake-failure occurs to the car. However, in the end we reached the wonderful hotel Garden Court on Nelson Mandela Boulevard safely. We didn't get more than 20 minutes for refreshing ourselves, as a meeting was due soon in True Alliance office. I did not anticipate that the meeting would be a tough one. Some of our shipments got delayed and we tried our best to convince them to accept late deliveries. But they won't budge.

Let me drop the hard part and just focus on the dinner with three bosses of True Alliance in the waterfront, which was just awesome. We enjoyed the food and the company of them so much.

On 21st Feb, the international mother language day, we were taken to Woolworths head office. The reception there looked like an immigration station with cameras and modern system of registration of the visitors.

We faced another stormy meeting there explaining our delivery performances to the Woolworths top managers. Later we got introduced with the designers, technicians, models for fit sessions, production, commercial and sourcing team one by one. I could never imagine that Woolworths people would receive us

so warmly. It was a memorable day for us. We were very impressed with the lunch arrangements and the shop visit afterwards.

22nd Feb'13 was the most important day of our visit to Woolworths. I was deeply impressed listening to the wonderful presenters like CEO, MD, Director and Managers of different disciplines.

CEO, Mr. Ian Moir, talked in brief about their three business categories like Clothing, Food & Beauty. He emphasized on driving for price and short lead-time. The target of Woolworths was to make their business double by 2020.

Ms. Paul Disberry, a director, shared with the audience about the customer behavior analysis. Research says that 57-year old people were the highest spending group and 40-year old people were the most popular group amongst the four kinds of people in South Africa like Black, White, Colored and Asian. Body shape, Fit, Style, Color, Fashions and Price were considered for decision-making parameters for every order placement.

Mr. Justin Smith, Compliance Manager, talked in detail about the Health & Safety, Minimum Wages and Restrictions on using hazardous chemicals in the production processes.

Mr. Darren Todd, Sourcing Director, spoke about the sourcing & innovation strategy providing information on current statistics. At the moment Woolworths was buying 34% from South Africa, 43% from China, 12% from Mauritius/Madagascar & 11% from Bangladesh/India. They would check the possibilities of sourcing from Vietnam/Cambodia/Myanmar in future. He emphasized repeatedly on innovation & technology improvement in his speech.

The presenters of Supply Chain Management, Stock Management and Customers Relationship Management also did their presentations in quite interesting ways.

There was a young and beautiful lady presenter Nikki Cockroft, who talked about E-Commerce as the Head of Online Market Share. She made the presentation in such an attractive way with her interesting gestures, postures that the whole of the audience could understand how important online shopping was. I was sure that sales through online for Woolworths would increase very soon because of her very attractive presentation.

Finally, the moment came for the suppliers who did their best to serve Woolworths with respect to quality, service, delivery & price. Mr. Darren Todd and Ms. Paul Disberry were on the stage to declare the nominations and awards for the suppliers, local & international both.

We were sad for not getting any award though we were nominated for two categories. I realized-Good is no good when better is possible. Before leaving the conference centre we committed to ourselves that we would work harder for future.

There was an invitation for all attendants in the conference to join the charity ball evening on the following day. Ms. Paul was giving the briefing about charity ball program in an excellent way, which made us all anxiously waiting for the moment to come.

We had the full day before the charity ball of 23rd Feb evening, so the boss of True Alliance arranged a tour for us in the morning to a historical place called Robben Island. This was the place where Mr.Nelson Mandela and many other political leaders including current South African President Mr. Jacob Zuma were imprisoned for years/decades. I would never forget this four-hour trip on the Atlantic Ocean. Most of the tourists couldn't control their emotions listening to the terrible sufferings that the leaders had undergone to establish the right of the people of their own country. The narration came from the mouth of a prisoner of that time.

We were waiting in the hotel for the Charity Ball program after coming back from the Robben Island. Two bosses of True Alliance came to pick us up. They were in formal attires. I never saw Mr. Howard Blend in formal dresses before.

It was an amazing evening for all the attendants there. The auction session was a remarkable event where a lady conducted the program and collected nearly one million Rands as donation from the audience through her fabulous presentation. I was told that Woolworths would donate matching the amount collected. So two million Rands would be donated for charity. I would never forget the colorful evening we all enjoyed.

24th Feb'13 was another beautiful day for having lunch at the beachside restaurant with two bosses of True Alliance and doing little bit of shopping at the waterfront. Mr. Nigel was appreciating our participation and he reminded us of the target for more business in future.

We started missing our families but on the other hand also felt a deeper attraction for the wonderful city of Cape Town. It seemed like 25th Feb'13, the day of returning to homeland, came very quickly, as we had been enjoying every moment in Cape Town the wonderful company of our counterparts, throughout the trip.

Before flying back to Dhaka, the visit of Table Mountain with Mr. Cuan was another wonderful memory for us. Mr. Cuan had lived in Bangladesh for eight months, so he knew why we were so overwhelmed. I never thought the top of a mountain could be so wide where people could easily pass a day walking & running around. We didn't have enough time but still we walked there for three hours and took many photographs in different approaches. Fortunately we had with us one passionate photographer, Mr. Anwar Liton, who took pictures of his every moment in Cape Town. The photographs he took would make the trip remain alive forever.

I consider myself very lucky to be able to visit one of the beautiful cities in the world and I will consider myself even luckier if I will find a space in Babylon Kathokata to share my experiences from my trip to Cape Town.

Long Live Cape Town !
Long Live Babylon Kathokata!

ব্যাবিলন গ্রুপের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ছবি
(A few snapshots of Babylon Group)

One of the scholarship recipients is receiving her cheque from the chief guest Mr. Dr. Wahiduddin Mahmud, Professor, Dhaka University in Scholarship Awarding Ceremony-2012 (3rd batch)

Famous author Selina Hossain is unwrapping the 7th issue of Babylon Kathokata along with Babylon Directors and Mr. Rodney J Reed, Managing Director of Reed Consulting (Bangladesh) Ltd.

Babylon team is distributing warm clothes to the cold affected people of South Bengal in December 2012.

Mr. Saikul Islam, Assistant Director, Labour, Ministry of Labour and Employment, monitors Participation Committee (PC) election at Babylon Garments Ltd. held on 19th January 2013.

Babylon Directors handing over the first cheque of Tk. 20 lac of the committed Tk. 70 lac to the representative of Ahsania Mission Cancer & General Hospital.

A team performance by Babylon's employees focusing the theme 'Team Babylon' on the day of annual picnic & cultural programme -2012.

ব্যাবিলন গ্রুপের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ছবি

(A few snapshots of Babylon Group)

A glimpse from the fashion show by the workers of Aboni Knit Wear Ltd. on the day of Annual picnic & cultural programme-2012.

Babylon Director Mr. Abdus Salam is receiving "Award for Best Innovative Idea" In the Best Innovative Ideas Category in Social & Environmental Excellence Award-2012, organized by Bangladesh Brand Forum & GIZ.

Babylon team is helping the tornado affected people at Brahmanbaria with cash money in April 2013.

UK Minister of State for International Development Mr. Alan Duncan visits Babylon on 5th June 2013 and meets Workers Participation representatives.

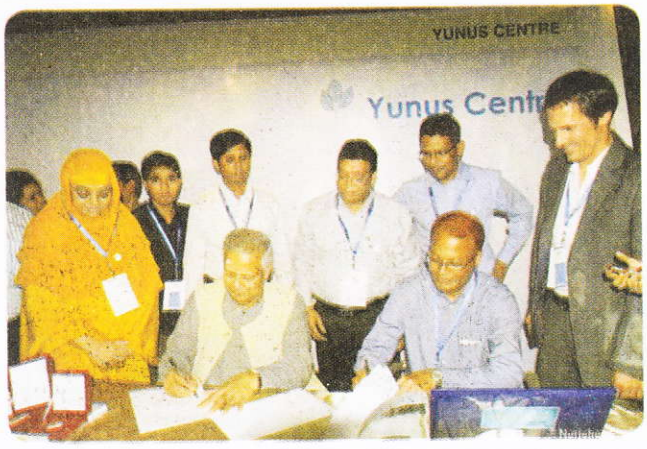

Memorandum of Understanding (MoU) signing ceremony between `Softy' and `Grameen Fabrics & Fashions Ltd.' in June 2013.

TESCO is giving Gold Supplier Award-2013 to Aboni Knit Wear, a sister concern of Babylon Group.

NEWGEN

Transforming Technologies for Tomorrow

Prottay

BABYLON

Babylon Group has entrusted and awarded a contract to Newgen Technology Limited for its end-to-end business process automation. Under this initiative, Newgen has started collecting business requirement, capturing AS-IS-Processes and workflows across the Group, consisting 19 sister concerns located in and around Dhaka.

Under this project, following functions activities and processes will be automated.

- *Marketing & Sales*
- *Supply Chain & Inventory Management*
- *Accounting & Finance*
- *Human Resources (real-time attendance system, payroll and personnel information)*
- *Administration and Logistic Management*

Newgen will design, develop and implement an Information and Database System which will be consisting Computers, People, Procedures, Workflows and Software that store, organize and deliver information for reporting and management decision making. Over a period of time, Babylon would be able to analyze these stored historical data for trend analysis and forecasting.

Once automation is complete and data migrated to this complete system namely ERP, Babylon would be in a position to improve its planning, productivity, optimize cost and increase overall efficiency across the functions of Babylon Group.

Hotline:9023495-6, 9023462-3 Ext : 405,406, Email:info@newgenbdworks.net, Web: www.newgen-bd.com

ব্যাবিলন গ্রুপের প্রতিষ্ঠানসমূহ:

- ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ
- ব্যাবিলন ড্রেসেস লিঃ
- সুরভী গার্মেন্টস লিঃ
- অবনী ফ্যাশন্স্ লিঃ
- অবনী টেক্সটাইলস লিঃ
- অবনী নীট ওয়্যার লিঃ
- জুনিপার এমব্রয়ডারীজ লিঃ
- ব্যাবিলন ট্রিমস লিঃ
- ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ
- ব্যাবিলন ওয়াশিং লিঃ
- ব্যাবিলন বায়িং সার্ভিসেস লিঃ
- ব্যাবিলন আউটফিট লিঃ (ট্রেন্ডজ)
- ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিঃ
- ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস
- ব্যাবিলন লজিস্টিক্স লিঃ
- ব্যাবিলন মেরিন ভেনচারস্
- ব্যাবিলন এগ্রিসাইন্স লিঃ
- নিউজেন টেকনোলজি লিঃ

Head Office:

2-B/1 Darus Salam Road, Mirpur
Dhaka-1216, Bangladesh.
Tel : 8023495-6, 8023462-3 (Off)
9007175, 9010533, 8011089 (Fac)
Fax : 880-2-8032949
E-mail : babylon@babylon-bd.com
Web : www.babylongroup.com